জুলাই ২০২১ ■ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক

এগিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

শতবর্ষের পথ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

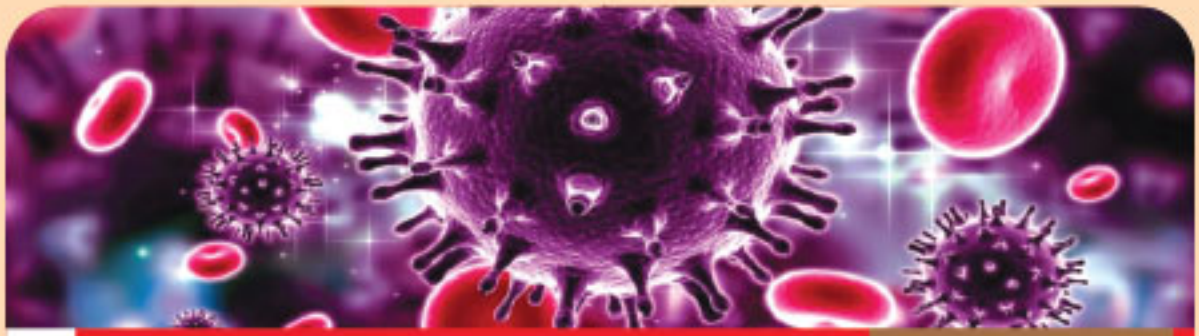

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই ২০২১ ❑ আষাঢ়–শ্রাবণ ১৪২৮

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩রা জুন ২০২১ জাতীয় সংসদে তাঁর অফিসকক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বিলে স্বাক্ষর করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

৩রা জুন জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ বাজেট উপস্থাপন করেন। এটি দেশের ৫০তম বাজেট (১টি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটসহ ৫১তম)। আওয়ামী লীগ সরকারের ২১তম এবং বর্তমান অর্থমন্ত্রী উপস্থাপিত তৃতীয় বাজেট। এবারের বাজেটের শিরোনাম 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'। প্রস্তাবিত এ বাজেটের আকার ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বাজেটে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীবন ও জীবিকা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যাবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কৃষি খাতকে। প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সংসদে আলোচনা শেষে ৩০শে জুন কণ্ঠভোটে পাস হয়। ১লা জুলাই ২০২১ থেকে এ বাজেট কার্যকর। করোনাকালকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত এ বাজেটের ওপর *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

মুসলমানদের একটি বড়ো ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহা আসে আনন্দ ও ত্যাগের মহিমা নিয়ে। করোনা মহামারির এ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু কোরবানি ও অভাবগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোই হবে প্রকৃত মুসলমানদের কাজ। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে এর বিকল্প নেই। ঈদুল আজহা নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ অন্যতম। বোদ্ধাদের মতে, শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, গীতিকার, শিক্ষক। ২০১২ সালের ১৯শে জুলাই নন্দিত এই কথাসাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

২৮শে জুলাই বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। হেপাটাইটিস সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী এ দিবস পালিত হয়। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২১-এর প্রতিপাদ্য হলো: 'হেপাটাইটিস অপেক্ষা করে না'। হেপাটাইটিস দিবসকে উপলক্ষ করে সচেতনতা গড়ে তুলতে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া এ সংখ্যায় রয়েছে অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও প্রতিবেদন। আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহ্‌রীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক এগিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান ৪
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

করোনা মহাদুর্যোগে বাংলাদেশের অর্থনীতি ১২
প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক সুরক্ষা ও বাজেট ১৪
প্রণব মজুমদার

সাহসী ও সময়োপযোগী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ১৭
এম এ খালেক

ঈদুল আজহা, হজ ও কোরবানি ২৩
মুহাম্মদ ইসমাঈল

শতবর্ষের পথ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৫
শ্যামল দত্ত

হুমায়ূন আহমেদ শিল্পী ও চলচ্চিত্রের নিখুঁত কারিগর ৩০
ইমরুল কায়েস

উত্তর অঞ্চলের সমতল ভূমিতে চা চাষ ৩২
মো. জাহাঙ্গীর আলম

ইয়াস মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা ৩৪
ইমরুল ইউসুফ

কবি লুইজ গ্লিকের কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বিশ্বজনীনতা ৩৬
মো. ঈমাম হোসাইন

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার ৩৮
জান্নাতুল ফেরদৌস

হেপাটাইটিস প্রতিরোধে সচেতনতা ৩৯
অনিল কুমার

প্রাণ ফিরে পাচ্ছে চিলমারী নদীবন্দর ৪০
মো. মাইদুল ইসলাম

গল্প

ভাগাভাগি ৪১
নাসিম সুলতানা

হ্যালো? ৪২
সায়েরে নাজাবি সায়েম

হাইলাইটস

কবিতাগুচ্ছ ৪৩-৪৭

অলিতাজ মনি, মোস্তফা পাশা, শেখ সালাহ্উদ্দীন, আবু জাফর আবদুল্লাহ, মো. মোশাররফ হোসেন, এনামুল খাঁন, নীলিমা আক্তার নীলা, লিলি হক, জুনান নাশিত, কামাল হোসাইন, গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন, মো. কামাল শেখ, রাজিয়া সুলতানা পিংকি, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, মো. ইউনুছ আলী, আল মামুন, ফায়েজা খানম, ফাহমিদাতুন্নেছা, হেলাল হোসেন কবির, রুস্তম আলী, সোহেল রানা, মনির জামান, রানা হোসেন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮
প্রধানমন্ত্রী ৪৯
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫০
আন্তর্জাতিক ৫১
উন্নয়ন ৫২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
শিক্ষা ৫৩
বিনিয়োগ ৫৪
নারী ৫৫
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫
কৃষি ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
বিদ্যুৎ ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
যোগাযোগ ৫৯
কর্মসংস্থান ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী ৬৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুলাই ২০২১ জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ দেন– পিআইডি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক এগিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জ। একেবারে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে। বঙ্গবন্ধুকন্যাও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একইসঙ্গে প্রচণ্ড গতিশীল এবং ব্যাপক মাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক করে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলকে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাধীনতার পর পর প্রায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ ও বৈরী প্রকৃতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ বিষয়ে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক: এগিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–**৪**

সাহসী ও সময়োপযোগী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

জাতীয় সংসদের জুন সেশনের দ্বিতীয় কর্মদিবসে ৩রা জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাষ্ট্রীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের এটা ত্রয়োদশ ধারাবাহিক বাজেট এবং অর্থমন্ত্রীর উপস্থাপিত তৃতীয় বাজেট, যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ বাজেট। এতে অর্থমন্ত্রী যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। প্রস্তাবিত বাজেটে করোনার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে 'জীবন ও জীবিকা'র ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের আয়তন বা আকার হচ্ছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। এ বিষয়ে 'সাহসী ও সময়োপযোগী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–**১৭**

শতবর্ষের পথ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা মহানগরীর সবুজ পরিবেশ রমনার ৬০০ একর জায়গাজুড়ে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই কলা, বিজ্ঞান ও আইন এই তিনটি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন মাত্র একজন। পি জে হার্টগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। শিক্ষকদের অনেকেই যেমন সুপণ্ডিত ও জগদ্বিখ্যাত, তেমনি অনেক ছাত্রেরই খ্যাতি রয়েছে দেশ-বিদেশে। 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু জ্ঞানচর্চায় নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। এ বিষয়ে 'শতবর্ষের পথ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–**২৫**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক

এগিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাঙালিকে কেউ 'দাবায়ে রাখতে' পারবে না। কয়েক দশক ধরে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলার মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে পেরেছিলেন বলে এবং তাদের সংগ্রামে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে নেতৃত্ব দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন বলেই তিনি এমন আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ সেদিন করতে পেরেছিলেন। এটা নিছক কথার কথা ছিল না। তাই বহু সংগ্রামের পর আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্বাধীন বাংলা বাস্তবায়ন করতে পেরেই বঙ্গবন্ধু থেমে যাননি। বরং দ্বিগুণ তেজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দেওয়ার কাজে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। একেবারে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল তাঁকে। 'সোনার বাংলা'কে পাকিস্তানিরা প্রকৃত অর্থেই শ্মশানের চেহারায় রেখে পালিয়েছিল। রাস্তাঘাট, রেললাইন, বন্দর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক– কিছুই ছিল না। তদুপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা, কোটি খানিক শরণার্থীর পুনর্বাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন পুনর্নির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। ভাবতে অবাক লাগে যে, তিনি যখন দেশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তখন অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র আট বিলিয়ন ডলার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূন্য। জিডিপি'র তুলনায় সঞ্চয়ের অনুপাত তিন শতাংশ। আর বিনিয়োগের অনুপাত নয় শতাংশ। শুধু তাই নয়, আমাদের নিজস্ব উদ্যোক্তা শ্রেণি বলতে গেলে ছিলই না। পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন উদ্যোক্তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতেই দেয়নি। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্যোক্তারা তাদের উদ্যোগগুলো অরক্ষিত রেখেই বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়। তাই ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্পকারখানাগুলো পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে উপর্যুপরি আঘাত হেনেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও আমাদের অনুকূলে ছিল না। একদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য দ্রুত বাড়ছিল, অন্যদিকে খাদ্য সহায়তা নিয়ে পরাশক্তিগুলোর রাজনীতি– এসবের ফলে বাংলাদেশ সত্যিই ভীষণ নাজুক অবস্থায় ছিল[১]।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে বঙ্গবন্ধু যেমন করে অপশাসকদের শত বাধা শত অত্যাচারের মুখেও দমে যাননি, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও বহুমুখী চ্যালেঞ্জ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। বরং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সে উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সামনে স্থাপন করে চলেছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে। দ্রুততম সময়ে প্রণয়ন করেছিলেন জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা– এই চার মূল স্তম্ভের ভিত্তিতে সংবিধান। ১৯৭২-এর ঐ সংবিধানের মৌল নীতিমালায় মানবাধিকার, বিকেন্দ্রীকরণ, সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার মাধ্যমে 'সকলের জন্য সমান সুযোগ'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, ২০ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর মতো কাজগুলো বঙ্গবন্ধু সম্পদের প্রবল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রাধিকার দিয়ে করতে সক্ষম হয়েছিলেন দ্রুততম সময়ের মধ্যেই। একই সঙ্গে তিনি দেশের সেরা অর্থনীতিবিদ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমবেত করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশনে। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিকল্পিত উপায়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শুরু থেকেই তিনি দুপায়েই হাঁটছিলেন। কৃষি ও শিল্পের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে তিনি ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনাতে কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রীয় বিবেচনায় ছিল। কারণ এ ভূখণ্ডের অর্থনীতিও সেসময় ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর। তাই স্বভাবতই কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ, ভরতুকি বা বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলে করা এক লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য এবং রেশন সুবিধা চালুর মতো উদ্যোগগুলো বাংলাদেশে শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু[২]। কৃষির জন্য গঙ্গার পানি বণ্টন ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য যৌথ নদী কমিশন গঠন এবং পানিচুক্তি সম্পন্ন করাও তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি অগ্রাধিকারের পরিচয় বহন করে। এর পাশাপাশি কৃষি গবেষণা এবং জনশক্তিকে উৎসাহ দেবার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিআইআরআই প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি স্নাতকদের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি তাঁর কৃষি-দরদি নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালে কৃষিকে দেওয়া এই পৃষ্ঠপোষকতার সুফল পেয়েছে পুরো সামষ্টিক অর্থনীতিই। তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত গতি আনতে যে কৃষির পাশাপাশি শিল্পকেও দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিকশিত করতে হবে সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ছিল সজাগ দৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে বৃহৎ শিল্প পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণির অনুপস্থিতির কারণে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প খাতের বিকাশের পথ বেছে নেন। এর ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিল্পোৎপাদনও বেড়েছিল। তবে ধীরে ধীরে

এই 'স্টেইট-লেড মডেল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট' থেকে ব্যক্তি খাতে শিল্প বিকাশের দিকে যাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি শুরুতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি খাতের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ১৯৭৪-১৯৭৫-এ এসে দেখতে পাই, তিনি ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের সীমা ২৫ লক্ষ থেকে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করেছেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করেছেন[৩]।

স্পষ্টতই স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে বিপুল সংখ্যক তাৎক্ষণিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কল্যাণকেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, উন্নয়নের সুফলগুলোকে টেকসইভাবে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাওয়ার একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করার জন্য[৪]। একই সঙ্গে ছোটো অর্থনীতির দেশের জন্য মানবসম্পদই যে সবচেয়ে বড়ো শক্তি হতে পারে সেটিও স্পষ্ট ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির কাছে। তাই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদী শিক্ষিত তরুণদের প্রস্তুত করতে যারা পরবর্তীকালে সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। এর আগে ১৯৭০ সালের প্রাক-নির্বাচনি ভাষণেও তিনি শিক্ষা খাতে জিডিপি'র অন্তত চার শতাংশ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল চার বছরেরও কম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বহু বিশেষজ্ঞের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে তিনি বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের 'এক্সপ্রেস ওয়ে'তে তুলে দিয়েছিলেন। এত অল্প সময়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র অর্থনীতির এমন করে ঘুরে দাঁড়ানোর ঘটনা ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। ঐ অল্প সময়েই তিনি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তিই শুধু দিয়েছিলেন তা নয়, বরং দ্রুতগতির এবং জনগণ-কেন্দ্রিক উন্নয়নের আগামীর পথ-নকশা জনগণের সামনে হাজির করে তিনি সকলকে আশাবাদীও করে তুলেছিলেন। দ্রুত পুনর্বাসন শেষ করে তিনি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়ে ২৭৩ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল[৫]। বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কমতে থাকে। পরে এই আয় বাড়লেও বঙ্গবন্ধুর আমলের পর্যায়ে পৌঁছাতে আরো এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। কাজেই ঐ অভিযাত্রায় ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে যদি ছেদ না পড়ত, যদি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেওয়া হতো তাহলে আজকে আমরা কোথায় থাকতাম তা ভাবতেই অবাক লাগে!

এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক যে, বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রা পরের দুই দশকে মন্থর হতে হতে প্রায় থেমে গিয়েছিল। গত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতে উদারীকরণের ফলে অর্থনীতিতে কিছুটা গতি এলেও তা প্রত্যাশা ও আমাদের প্রকৃত সম্ভাবনার তুলনায় নিতান্ত নগণ্যই বলতে হবে। তবে বঙ্গবন্ধু আমাদের মননে ও চিন্তায় সব সময়ই ছিলেন, আছেন। তাই বহু বাধা ডিঙিয়ে এগুনোর যে মানসিকতা তিনি এ জাতির মধ্যে তৈরি করে দিয়ে গেছেন তার কল্যাণেই আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। আর তার ফলে ১৯৯৬-এ দেশ আবার সঠিক পথে ফেরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই বঙ্গবন্ধুকন্যা তাঁর পিতার দেখানো পথে দেশকে সবার জন্য উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে শুরু করেন। তাঁরও একই উদ্দেশ্য ছিল– দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া। সামাজিক পিরামিডের নিচের অংশকে আরো শক্তিশালী করা। ২০০১-এ ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতায় আবারো এ অভিযাত্রায় ছেদ পড়েছিল। কিন্তু জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করে করে ক্ষমতায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধুকন্যা ২০০৯ সালে। আর তারপর থেকে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতি তো যেন কল্পনাকেও হার মানিয়েছে! সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সকল সূচকে আমরা যেমন অভাবনীয় গতিতে এগিয়ে গিয়ে সকলের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছি, তেমনি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির জোরে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও করোনা মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও নিজেদের

সক্ষমতার প্রমাণ রেখে চলেছি।

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে বেপথ হয়ে পড়া দেশ এবং দেশের অর্থনীতিকে বঙ্গবন্ধুকন্যা কেবল সুপথে ফিরিয়ে এনেছেন তা-ই নয়, আমাদের অর্থনীতিকে একই সঙ্গে প্রচণ্ড গতিশীল এবং ব্যাপক মাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক করে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলকে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭৫-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি সাত গুণেরও বেশি বেড়ে ২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ১,৬৬,৮৮৮ টাকায়। ১৯৯০-পরবর্তীকালে মাথাপিছু আয় আগের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুত বেড়েছে ঠিকই, তবে বিশেষ করে বিগত ১০-১২ বছরে এক্ষেত্রে নাটকীয় গতি এসেছে। লক্ষ করার বিষয়, ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছে তার ৭৩ শতাংশই হয়েছে গত এক দশকে। একই কথা প্রযোজ্য প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রেও। গত এক দশকে জিডিপি গড়ে ৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। অথচ আগের দুই দশকের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ[৬]।

বেগবান এই অর্থনীতির গতিধারা থেকে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, এর পেছনে কাজ করেছে সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা। এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই জিডিপি'তে কৃষির অবদান কমেছে। আর সে স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করেছে শিল্প খাত। আধুনিক অর্থনীতির রূপান্তরের এটিই পরিচিত পথ। আর বাংলাদেশ সে পথেই হাঁটছে। শিল্প খাতের প্রসার মানেই আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রসার। বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ নারী কর্মীর ব্যাপক কর্মসংস্থান রপ্তানিনির্ভর শিল্পায়নকেই শুধু প্রতিযোগী করেছে তা-ই নয়, দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নেও তা নয়া মাত্রা যুক্ত করেছে। ফলস্বরূপ জিডিপি'তে শিল্পের অবদান এসময়ে ১৭.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫ শতাংশ। আরো দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ করে ২০১৫-পরবর্তীকালে জিডিপি'তে শিল্পের অবদানের এক ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে (প্রাগুক্ত)। শিল্প খাতের বিকাশে সরকারের বিশেষ মনোযোগের প্রতিফলন এখানে ঘটেছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

তবে উল্লেখ্য যে, জিডিপি'তে কৃষির অবদান কমে এলেও কৃষি উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে। তার মানে কৃষিতে আধুনিকায়ন ঘটেছে। উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। স্বাধীনতার পর পর আমরা বছরে গড়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করছিলাম। আর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কৃষি জমির পরিমাণ খানিকটা কমলেও আমাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশি। খাদ্য উৎপাদন সূচকের বিচারে আমরা পেছনে ফেলতে পেরেছি ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশকেও। বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন সূচকের মান ২০১৬ সালের হিসাব অনুসারে ১৪৫.৩ (ভারতের ১৪৪, চীনের ১৩৯ এবং ভিয়েতনামের ১৩৬)[৭]।

তবে কৃষি উৎপাদনের এমন নাটকীয় বৃদ্ধির পরও কিন্তু কৃষি মজুরি কমেনি বরং বেড়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলে কৃষির পাশাপাশি বিকাশ ঘটেছে অ-কৃষি খাতেরও। গ্রামে পুঁজির প্রবাহ বেড়েছে। ব্যাংকিং সেবা আধুনিক ও সহজ হওয়ায় শহর ও বিদেশ থেকে দ্রুত অর্থের প্রবাহ বেড়ে চলেছে। প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দ্রুত অর্থ লেনদেন হচ্ছে। গ্রামে ব্যাংকের শাখা ও উপশাখার সংখ্যা বেড়েছে। কৃষি ও এসএমই ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এমএফআই'গুলোও গ্রামে আনুষ্ঠানিক ঋণের প্রবাহ বাড়াতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। গ্রামীণ আয়ের বড়ো অংশটিই (৬০%) এখন আসছে অ-কৃষি খাত থেকে। দেশের গ্রামাঞ্চল একদিকে বর্ধিষ্ণু শিল্প ও সেবা খাতের কাঁচামাল ও মূল্য সংযোজিত পণ্য/সেবা সরবরাহ করছে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে নতুন ভোক্তা হিসেবে তারা অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মোট কথা, গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি বড়ো মাত্রার স্বনির্ভরতা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ বিকাশের ফলে। বঙ্গবন্ধু এমন পরিকল্পনা নিয়েই এগুচ্ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা সেই পরিকল্পনার সুদক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছেন। সকল খাতই একযোগে এই ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশলকে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দরকার হয়েছে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ। সেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ধারাবাহিক উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত দশকে নাটকীয় অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের জিডিপি'র আকার বৃদ্ধি দ্রুত হয়েছে। বাহাত্তরের আট বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এখন একচল্লিশ গুণের বেশি বেড়ে ৩৩০ বিলিয়ন ডলার পার হয়ে গিয়েছে। তবে তার চেয়েও বেগবান রয়েছে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির ধারা। তাই বিনিয়োগ-জিডিপি'র অনুপাত ক্রমশ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ছিল ২৬:৩, আর ২০১৮-২০১৯ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১:৬-এ। একে কেবল ৫.৩ শতাংশ বৃদ্ধি হিসেবে দেখলে ভুল হবে। কারণ এই সময়কালে জিডিপি'র আকারও কিন্তু বেড়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে এই বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকার ও ব্যক্তি খাত উভয়ই ভূমিকা রেখেছে। এসময়ে জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে সরকারি বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭ থেকে ৮.১৭ শতাংশ। আর জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৬ থেকে ২৩.৪ শতাংশ[৮]।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও এ কথা মানতে হবে যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ এখনো প্রধানত সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই নীতিনির্ধারকরা বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের গতি বাড়ানোর জন্য আমাদের নিয়মনীতি আরো স্মার্ট ও সহজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার এদিকটায় এখন নজর দিচ্ছে। এসব ইতিবাচক উদ্যোগের কিছু সুফল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। ব্যাবসার পরিবেশ নিয়ে করা বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সূচকে বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় আট ধাপ এগিয়ে ২০২০ সালে ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম হয়েছে[৯]। তাদের মতে, যে প্রধান তিনটি পদক্ষেপ বাংলাদেশের এ অগ্রগতির পেছনে ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হলো– (ক) নতুন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠার শর্ত ও নিয়মাবলি সহজিকরণ, (খ) বিদ্যুৎ সংযোগ সহজলভ্য করা এবং (গ) ঋণ বিষয়ক তথ্যপ্রাপ্তি সহজিকরণ।

বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছাটুকু দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)-এর তথ্য মতে, ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩ হাজার মেগাওয়াটের কম। ২০০৭-২০০৮ নাগাদ এই সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশিতে (অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি)। আর এর পরের বারো বছরে এই সক্ষমতা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াটে (অর্থাৎ প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি)।

ব্যাবসাবাণিজ্যের নিয়ম সহজিকরণ এবং বিদ্যুতের সহজলভ্যতার প্রভাবে বিনিয়োগের মাত্রা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি নির্দেশক হতে পারে শিল্প ঋণের বিতরণ বৃদ্ধি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, সাম্প্রতিক ব্যাংকিং খাতের বিতরণকৃত ঋণ সত্যিই দ্রুত বাড়ছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে মোট বিতরণকৃত ঋণ ছিল ৩৮ হাজার কোটি টাকার সামান্য বেশি, আর ২০১৮-২০১৯-এ তা দশ গুণেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা। কাজেই আশা করা যায়, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেলে এবং উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে পরবর্তী দশকে কেবল মোট বিনিয়োগ বাড়বে তাই নয়, মোট বিনিয়োগে ব্যক্তি খাতের অংশও বৃদ্ধি পাবে।

কৃষি ও শিল্প খাতের ধারাবাহিক বিকাশ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০১৮-২০১৯-এ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। অর্থাৎ এসময়ে ১০০ গুণেরও বেশি রপ্তানি আয় বেড়েছে[১০]। যদিও কোভিড-১৯-এর প্রভাবে উন্নত দেশে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্যের চাহিদা সংকুচিত হয়েছে তবুও আমাদের ধারণা সাময়িক এই সংকট সারা বিশ্বই কাটিয়ে উঠতে পারবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং আমাদের পণ্য আমদানি করা দেশসমূহে যেভাবে টিকা অভিযান গতি পেয়েছে তাতে আগামী দিনে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হবে বলে আশা করা যায়।

২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানিতে এক ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭৩-১৯৭৪ থেকে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ৬৬ শতাংশই হয়েছে ২০০৭-২০০৮ পরবর্তীকালে (প্রাগুক্ত)। মূলত বস্ত্র খাতের আধুনিকায়ন ও ক্রেতাদের চাহিদা মতো পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে প্রতিযোগীদের চেয়ে কম দামে আমাদের পণ্য রপ্তানি করার এই সাফল্য সত্যিই অসামান্য। কাজেই একথা বলাই যায় যে, একদিকে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ বিকাশ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বাড়িয়েছে, অন্যদিকে ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে আরো বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো একটি পরিবেশও বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে।

তবে কেবল আরএমজিনির্ভর রপ্তানি নয়। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সাফল্যের পেছনে আরো যে শক্তিটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা হলো প্রবাসী আয়। ১৯৭৬-১৯৭৭ অর্থবছরে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার, আর তারা বছরে গড়ে ৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে পাঠাতেন। ২০১৮-২০১৯-এর হিসাব বলছে বিদেশে কর্মরত আছেন প্রায় ৭ লক্ষ বাংলাদেশি নাগরিক আর ঐ বছর তারা দেশে পাঠিয়েছেন ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি (প্রাগুক্ত)। প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভরসার জায়গা হিসেবে কাজ করেছে শুরু থেকেই। তবে যথাযথ নীতি ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও দেশে আসা অর্থের পরিমাণ আরো দ্রুত বাড়তে শুরু করে বর্তমান সরকারের আমলে। বিশেষ করে ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক খাতের কল্যাণে প্রবাসী আয়কে আনুষ্ঠানিকীকরণ সহজ হয়েছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে সরকারের দেওয়া প্রণোদনাও বেশ কাজ করেছে।

তবে দেশ চালাতে, বিশেষ করে বিদেশে পাঠানোর মতো দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে এবং কৃষি-শিল্পের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যয় বাড়াতে হয়েছে। আর তারজন্য বাড়াতে হয়েছে রাজস্ব আহরণ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, এক্ষেত্রেও গত ১০-১২ বছরে সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। নব্বইয়ের দশকের আগে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক আহরিত মোট রাজস্ব ছিল ৫ হাজার কোটি টাকার সামান্য বেশি। নব্বই দশকের শুরু থেকেই একদিকে অর্থনৈতিক উদারীকরণ শুরু হয়, অন্যদিকে বাড়তে থাকে সরকারের আহরিত রাজস্ব। তবে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আহরণে বাড়তি গতি সঞ্চারিত হয়েছে। তাই ২০১৮-২০১৯-এ এসে সরকারের আহরিত রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। তবে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরো অনেক ভালো করার সুযোগ রয়েছে। সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১২.৩ শতাংশ। একটি দ্রুত বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশ হিসেবে এ লক্ষ্যমাত্রা অন্তত ১৫ শতাংশ হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা[১১]। এক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের গতি ও স্বচ্ছতা বাড়ানো গেলে রাজস্ব আহরণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুইই বাড়বে বলে মনে হয়।

সর্বোপরি গত ১০-১২ বছরে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে সেটিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একই সঙ্গে বেগবান করেছে এবং এর ঝুঁকি সহনক্ষমতা বাড়িয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্ভাবনী নীতি উদ্যোগগুলো আশাতীত সুফল দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ব্যাংক হিসাবধারীদের এক-তৃতীয়াংশই এখন ডিজিটাল লেনদেন করছেন। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গড়ে এ অনুপাত মাত্র ২৮ শতাংশ। একইভাবে বাংলাদেশে ব্যাংক হিসাবগুলোর মাত্র ১০ শতাংশ অচল, যেখানে প্রতিবেশী ভারতে এ অনুপাত ৫০ শতাংশ[১২]।

করোনাজনিত বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা আসার আগের সময়টায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৫০-এর দশকের সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের সঙ্গে। ঐ দেশগুলো সেসময় থেকে পরবর্তী ২৫ বছর ধরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধির ওই ধারাকেই 'এশিয়ান গ্রোথ মডেল' বলা হয়। বাংলাদেশও বর্তমানে ঐ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারণ বাংলাদেশও ঐ দেশগুলোর মতোই অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ জনশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যাপক রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে, যুদ্ধ-পরবর্তী দুরবস্থা কাটিয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে এবং আরএমজি'র পাশাপাশি অন্য রপ্তানি পণ্য থেকেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত সুপরিকল্পিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আইসিটি পার্কগুলো বাংলাদেশের জন্য 'গেম চেঞ্জার' হয়ে উঠতে পারে[১৩]।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অর্জন ও সম্ভাবনাগুলোকে বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশের এমন সাফল্যের তিনটি প্রধানতম কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, তাঁর মতে বাংলাদেশের সরকার জাতীয় অগ্রযাত্রায় দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে (অর্থাৎ এনজিও'গুলোকে) কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, ফলে সামাজিক পরিবর্তনে তারা সরকারের পরিপূরক ভূমিকা রাখতে পেরেছে কার্যকরভাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিগত এক দশকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে

সেটিও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে বিশেষত অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। তৃতীয়ত, কৌশিক বসু মনে করেন যে, বাংলাদেশের তুলনামূলক তরুণ জনশক্তি এবং সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধানতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

তবে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সামাজিক পিরামিডের একেবারে পাটাতনে থাকা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সাফল্য বাংলাদেশ দেখিয়েছে সেটিই সবচেয়ে গুরুত্ববহ। নীতিনির্ধারকরা এদিকটিতে মনোনিবেশ করেছেন বলেই অতি ধনীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্য কিছুটা বাড়লেও ভোগ বৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। আর এর ফলে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে কোভিড হামলায় সাময়িকভাবে হলেও দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বেশ খানিকটা বেড়েছে। আশা করা যায়, অর্থনীতি স্বাভাবিক গতিতে ফিরলে এ দুটো ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার ছিল প্রায় ৪৯ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্য হার ছিল ৩৪ শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখা গেছে বলেই দুই দশকের মধ্যে দারিদ্র্য হার অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে ২২ শতাংশে এবং অতিদারিদ্র্য হার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কমিয়ে ১১ শতাংশে আনা সম্ভব হয়েছে[১৪]। তবে মহামারিজনিত অচলাবস্থার ফলে এ দুটি হার ইতোমধ্যে বেড়েছে। তবুও মহামারির আগে এ হারগুলো কমিয়ে আনার কৃতিত্ব সুবিবেচনাপ্রসূত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিকেই দিতে হবে এবং এর জোরেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য হ্রাসে আগের ধারাবাহিকতায় ফেরা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন নীতিনির্ধারক মহল।

তবে কেবল দারিদ্র্য নিরসনে নয়, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতির সুফল হিসেবে বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ অনেক নন-এলডিসি দেশকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। একটি এলডিসি দেশ হয়েও বাংলাদেশ একটি মধ্যম মানব উন্নয়নের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান কেনিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া ও জিম্বাবুয়ের মতো নন-এলডিসি দেশের চেয়ে ভালো[১৫]। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এ সফলতা আরো ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৯ অনুসারে বাংলাদেশ ঐ বছরে আরো এক ধাপ এগিয়ে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৫তম স্থানে চলে এসেছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এই অগ্রগতির প্রধানতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে– দারিদ্র্য হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার এবং স্বাস্থ্য সেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধিকে[১৬]। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে বাংলাদেশি নাগরিকদের গড় আয়ু ৬৬.৮ বছর থেকে বেড়ে ২০১৯-এ ৭২.৪ বছর হয়েছে এবং শিক্ষার হার ২০০৮ সালে ৫৪.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে ৭৩.২ শতাংশ হয়েছে।

বাংলাদেশ তার দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সর্বশেষ এই করোনা মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মোকাবিলার ক্ষেত্রে। প্রাথমিকভাবে এই অবিস্মরণীয় স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা করতে গিয়ে বাংলাদেশকেও আর সব দেশের মতো হিমশিম খেতে হয়েছে। তবে অচিরেই সরকারের সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত পেশাজীবীদের দক্ষতার গুণে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর অতি সম্প্রতি তো টিকা দেওয়ার কর্মসূচিও শুরু হয়েছে জোরেশোরে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের দীর্ঘ সফলতার রেকর্ড এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকসহ সকল মহলকে আশা দেখাচ্ছে। পাশাপাশি মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থায় এদেশের মানুষ বিশেষ করে নগরাঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত মানুষ ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে পড়লেও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াও শুরু করা গেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভালো করছে। এ কারণেই গেল ডিসেম্বরে (২০২০) ব্লুমবার্গ তার কোভিড রেজিলিয়েন্স ইনডেক্সের বিচারে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের একটি হিসেবে রেখেছে বাংলাদেশকে[১৭]।

মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সামাল দেওয়া এবং কার্যকরভাবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারার পেছনেও প্রধানতম ভূমিকা রেখেছে বিগত পাঁচ দশকে বিশেষ করে শেষ ১০-১২ বছরে যে শক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দেশকে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে সেটি। এ কারণেই বিশ্ব অর্থনীতির সংকোচনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি থাকছে ৪ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশের সমতুল্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে সরকারের পক্ষে। ধারণা করা হচ্ছে, এ অনুপাত ২০২১ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে ৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিশ্ব বাজারের মন্দা অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে ১ শতাংশ। এর বিপরীতে আমদানি কমেছে ১৩ শতাংশ। তাই বাণিজ্য ভারসাম্য উন্নতি হয়েছে। বিদেশি মুদ্রা খরচেও সাশ্রয় হয়েছে। তাই বিদেশি মুদ্রার তহবিল বাড়ছে। রপ্তানির ধারা অব্যাহত রাখা গেছে এবং প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়ানো গেছে বলেই রিজার্ভ এই করোনার বছরে বেড়েছে ৩১ শতাংশ। প্রাথমিকভাবে ব্যাবসাবাণিজ্যে এক ধরনের শ্লথ গতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রদান ১১ শতাংশ বৃদ্ধি থেকে বোঝা যায় যে সেখানেও গতি ফিরে আসছে। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে জনগণের নিত্যদিনের জীবনযাপনের ওপর ঐ অর্থে চাপ পড়েনি[১৮]। তাই মহামারির শুরুতেই বাড়তি তারল্য জোগানের সিদ্ধান্তটি যথার্থ ছিল। বাংলাদেশে এই সময়টায় দেশি ও বিদেশি দায় খানিকটা বাড়িয়েছে। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই। জিডিপি'র অংশ হিসেবে আমাদের মোট দায়-দেনা এখনো মধ্য ত্রিশ শতাংশেই আছে। এই হার আমাদের আয়ের দেশগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সন্তোষজনক।

প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই কৃষির ওপর জোর দিয়ে নীতি প্রণয়ন ও তার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন। আর এই মহামারিজনিত অচলাবস্থায় দেখা গেছে, এই কৃষিই বাংলাদেশের রক্ষাকারী হিসেবে হাজির হয়েছে। মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় চালকের আসনে থাকছে কৃষি খাতই। লকডাউনের মধ্যেও সরকারের সক্রিয় নীতি সমর্থন, স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর তৎপরতায় হাওর এলাকাসহ সর্বত্র বোরো ধান সুষ্ঠুভাবে কাটা সম্ভব হয়েছে। আমন মৌসুম নিয়েও সরকারের বহুবিধ পরিকল্পনায় ভালো ফলন নিশ্চিত করা গেছে। এখন আবার বোরোর দিকে নজর দিতে হবে[১৯]।

তবে বিগত ১০-১২ বছরে গৃহীত নীতি ও তার বাস্তবায়নের সুফল করোনাকালে পাওয়ার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে মহামারিজনিত অচলাবস্থায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখায় ডিজিটাল আর্থিক সেবাগুলোর ভূমিকা। আগেই বলেছি সরকারের সহায়তায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে ঐ সময়ই শুরু হয়েছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নীরব বিপ্লব। আর তার ফলেই চালু হয়েছিল মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মতো ডিজিটাল

আর্থিক সেবাগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহসী এবং সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি-উদ্যোগের ফলে চালু হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ সেবাগুলোর প্রসার ঘটেছে দেশে। আর এর বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে করোনার সময়ে। ২০২০-এর ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর সময়ে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের পক্ষে ব্যাংকে যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠায় এ সময়ে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস একাউন্টের সংখ্যা ১.৫ কোটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৬৪ কোটিতে। এসময়ের ব্যবধানে এই ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে মাসিক লেনদেনের পরিমাণ অভাবনীয় মাত্রায় বেড়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ সেবার ওপর আস্থা রেখে ৫০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে মহামারিকালীন বিশেষ নগদ সহায়তা দিয়েছে এর মাধ্যমে[২০]। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ওপর ভোক্তাদের আস্থা বাড়তে দেখে সিটি ব্যাংক মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবাদাতা বিকাশের সাথে যৌথভাবে পাইলট ভিত্তিতে চালু করেছিল অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কর্মসূচি। কাগজপত্রের জটিলতা এড়িয়ে কেবল মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের লেনদেনের রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত বিকাশ গ্রাহকদের ১০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার এই পাইলট কর্মসূচি চালু হয় ২০২০-এর জুলাই মাসে। এখন পর্যন্ত ১৮,০০০ গ্রাহককে এমন ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ঋণ খেলাপির হার মাত্র ১ শতাংশের মতো (০.৭%)। এ সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিটি ব্যাংক বিকাশের সকল গ্রাহকের জন্য এ সুবিধা চালু করতে চাইছে[২১]। বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চয় এমন আবেদনে সাড়া দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

একই রকম সাফল্য এসেছে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রেও। এই 'অফ ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং' সেবা বর্তমানে ২৪টি ব্যাংক দিচ্ছে ১৪,৪১৪টি এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে (অক্টোবর ২০২০-এর হিসাব অনুসারে)। মাত্র এক বছর আগে আউটলেটের সংখ্যা ছিল ৯,৭০৩। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের তুলনায় ২০২০-এর অক্টোবরে এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৮.৮ কোটিতে পৌঁছেছে। এসব হিসাবে আমানতের পরিমাণ এই এক বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৭৪৭ কোটি টাকায়। একই সময়ের ব্যবধানে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ, রেমিটেন্স প্রেরণ বেড়েছে চার গুণের বেশি। এসবই প্রমাণ করে যে, করোনাজনিত পরিস্থিতিতে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর ওপর মানুষ আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় নির্ভর করেছে[২২]। আর করোনাকালে এজেন্ট ব্যাংকিং আর মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের এমন ব্যাপক প্রসার থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে অভিযান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুরু করেছিল তার সুফল বাংলাদেশকে করোনাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা মোকাবিলায় ব্যাপক মাত্রায় সহায়তা করেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যে ব্যাপকভিত্তিক ইতিবাচক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছে তার জেরেই বৈশ্বিক মন্দার প্রাথমিক ধাক্কাটি অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভালোভাবে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে এ দেশ। তবে দেশের নীতিনির্ধারকরা এখানেই থেমে নেই। বরং এযাবৎকালে করোনা ও এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অচলাবস্থা মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নিয়েও পরিকল্পনা তৈরি করছেন তারা। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি প্রকাশিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। প্রায় পাঁচ দশক আগে বঙ্গবন্ধু যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জাতির সামনে হাজির করেছিলেন তখনও বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল অভ্যন্তরীণ ও ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। একই রকম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ২০২১ সালে জাতির সামনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাজির করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমন স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় এবং মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে একটি সুদূরপ্রসারী নীতিকাঠামোর আওতায় আনার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাহসী নেতৃত্বের প্রতিফলন।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বোধগম্য কারণেই প্রত্যাশিত লক্ষ্যগুলোতে কাটছাঁট করতে হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা (৮.২ শতাংশ) স্থির করা হয়েছিল তা কমিয়ে ৭.৭ শতাংশ করা হয়েছে করোনার কারণেই। তবে সারা বিশ্বের অর্থনীতি যখন সংকুচিত হচ্ছে সে অবস্থায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি হলেই সেটি হবে বড়ো প্রাপ্তি। ইতোমধ্যে ডিজিটাল অর্থনীতিতে চাঙ্গা ভাব দেখা যাচ্ছে, আর ভালো করছে কৃষিও। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে আর সার্বিকভাবে প্রণোদনার মনোযোগের জায়গায় রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতও। এ প্রেক্ষাপটে প্রায় ৬৫ লক্ষ কোটি টাকার এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধি সহায়ক উন্নয়ন ঘটিয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বরাবরের মতোই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি খাতকে। ৮১ শতাংশ বিনিয়োগই আসবে ব্যক্তি খাত থেকে। আর ব্যক্তি খাতের প্রয়োজনীয় বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির দিক নির্দেশনাও রয়েছে এ পরিকল্পনাতে[২৩]। ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন বিশেষ করে নিয়মনীতি সহজিকরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেলে এবং মেগা অবকাঠামোগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা গেলে এসব লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের যে সম্ভাবনাগুলো মহামারির আগে ছিল সেগুলো কিন্তু এখনো রয়ে গেছে। তাই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতেও ঐ সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়েই এগুতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভ্যালু/সাপ্লাই চেইনে দেশের অবস্থান আরও মজবুত ও ফলদায়ী করার কথা। করোনা মহামারির ফলে অনেক বিনিয়োগকারীর চীন থেকে সরে আসার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এ সম্ভাবনা আগের চেয়েও বেড়েছে। এজন্য অবশ্যই দেশের অভ্যন্তরে অবকাঠামো ও ব্যাবসার পরিবেশে উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। ইতোমধ্যে বিবিআইএন-মটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিমেন্টের কারণে যোগাযোগের উন্নতিতে গতি এসেছে। তবে যত দ্রুত এক্ষেত্রে উন্নতি করা যাবে ততই ভালো। এমনটি করা গেলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সহযোগিতায় নাটকীয় উল্লম্ফন খুবই সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা। বর্তমানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বাংলাদেশ খুবই ভালো করছে। অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবায়ুবান্ধব নিরাপদ কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কাজেই ভারতের কৃষি উৎপাদক এবং বাংলাদেশের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীদের সম্মিলিত কোনো উদ্যোগ বড়ো সাফল্য নিয়ে আসতে পারে এমনটি বলাই যায়[২৪]।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বাংলাদেশের শক্তি হিসেবে আগামী দশকে কাজ করবে তা হলো– এদেশের তুলনামূলক তরুণ জনশক্তি। ইউএনএফপিএ-এর প্রাক্কলনগুলো বলছে, ২০২৫ এবং তার পরেরও

বেশ অনেকটা সময়জুড়ে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে প্রাধান্য থাকবে ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সিদের[২৫]। একে বলা হয় 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'। দেশের ভেতরের ও বাইরের বিনিয়োগকারীরা স্বভাবতই এই তরুণ জনশক্তিকে তুলনামূলক কম মূল্যে কাজে নিয়োজিত করার সুবিধাটুকু নিতে চাইবেন। এই সুযোগটিই কাজে লাগাতে হবে নীতিনির্ধারকদের। আর তৃতীয়ত যে বিষয়টি বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে তা হলো এদেশের বর্ধিষ্ণু গ্রাহক/ভোক্তার সংখ্যা। এরা প্রযুক্তিনির্ভর। সত্যি বলতে বড়ো অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রেও তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অর্থনীতির প্রধানতম শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশেরও এমন শক্তি তৈরি হয়েছে বিশেষ করে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের প্রাক্কলন অনুসারে, মধ্যম ও উচ্চ মানের ভোক্তা ৩ লক্ষের বেশি রয়েছেন এমন শহরের সংখ্যা ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ছিল ১০টি, আর ২০২০-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭টিতে। তারা আরো বলছে, এমন শহরের সংখ্যা ২০২৫ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ৩৩টিতে[২৬]। ফলে বোঝাই যাচ্ছে এই ভোক্তারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াবেন। দেশের মাথাপিছু আয় যতই বাড়বে এ ধরনের ভোক্তার সংখ্যাও ততই বাড়বে। আর এই বাজারের সুফল নিতে আগ্রহী হবেন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরাও। দেশের ভেতরেও এসব ভোক্তার জন্য নতুন নতুন ব্র্যান্ড পণ্য উৎপাদিত হবে। এসবের পাশাপাশি আইসিটি'র প্রসারও বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রসারে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করবে। ২০১৯ সালের হিসাব অনুসারে, বাংলাদেশ বছরে বিশ্বের ৩৫টি দেশে ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইসিটি সেবা রপ্তানি করছিল, আর ২০২১ সাল নাগাদ এ পরিমাণ ৫ বিলিয়নে পৌঁছানোর কথা[২৭]। করোনা মহামারির ফলে এবং মহামারি পরবর্তী 'নিউ নরমাল' জীবনে আইসিটি'র ওপর নির্ভরতা সারা বিশ্বেরই বাড়বে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের আইসিটি সেবা রপ্তানির সম্ভাবনাও আগের প্রাক্কলনের তুলনায় বাড়বে। ফলে এই নতুন সৃষ্ট সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চাই নতুন মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি ও তার সফল প্রয়োগ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সব পরিবর্তনের চারা চোখে পড়ছে সেগুলোকে লালন করে বড়ো করতে হবে। এ জন্য মানুষের ওপর বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। মহামারির কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের ঝুঁকি ও গুরুত্ব নতুন করে স্পষ্ট হয়েছে। জীবন-জীবিকার স্বার্থেই এসব খাতে আসন্ন বাজেট এবং পুরো অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়জুড়েই উল্লেখযোগ্য হারে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতেও সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতির চাহিদা মতো প্রশিক্ষিত জনশক্তি উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিই যে বাংলাদেশের রক্ষাকবচ তা এখন প্রমাণিত। তাই এ খাতের আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিরাপদকরণ, বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, রপ্তানিকরণ ও সবুজায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-সমর্থন ও বাড়তি বিনিয়োগ অপরিহার্য। আরএমজি খাতের ওপর গুরুত্ব না কমিয়েও আইসিটিকে প্রবৃদ্ধির নয়া চালকের আসন করে দিতে হবে। এই সংকটকালে এ খাত তার শক্তিমত্তা দেখিয়েছে। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে সঙ্গী করেই বাংলাদেশের সরবরাহ চেইনকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো দক্ষ করা সম্ভব। সেজন্য বাড়তি বিনিয়োগ ও প্রণোদনা দরকার। সেজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নয়া অংশীদারিত্ব ও কৌশলের সন্ধানও অপরিহার্য। অবকাঠামো বরাবরই প্রবৃদ্ধিসহায়ক। রেল, শিপিং, বন্দর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন এবং এসবের জন্য উপযুক্ত অর্থায়নের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে নীতি-অগ্রাধিকার প্রদান ও সেসবের দ্রুত বাস্তবায়ন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে এখনও আমাদের অর্থনীতি ও সমাজে নানা মাত্রিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বিশেষ করে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং গুণগতমানের বাস্তবায়নের মতো প্রতিবন্ধকতা যে রয়েছে তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এসব চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধ করেই আমাদের উপরে-বর্ণিত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, স্বাধীনতার পর পর প্রায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করতে হলেও এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জ ও বৈরী প্রকৃতি মোকাবিলা করে হলেও বাংলাদেশ স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এক সময় যে দেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা হতো, সেই দেশ আজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে বিশ্বের সামনে হাজির করতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মধ্যে যে লড়াকু মনোবৃত্তির জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চ্যালেঞ্জ শুরুতে ছিল, এখনো আছে। কিন্তু বাংলাদেশ সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে সাহসিকতার সঙ্গেই। আর তাই অগ্রগতি যেমন হয়েছে, তেমনি এর সুফলও পৌঁছে গেছে সকল স্তরের নাগরিকদের কাছে। ফলে প্রবৃদ্ধি যেমন হয়েছে, তেমনি অর্জনগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা বা 'রেজিলিয়েন্স'ও তৈরি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তাঁর নিজেরই ৯ই মে ১৯৭২-এর বক্তৃতায়। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।' আমরা ঠিক তেমনই একটি বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের কাজ হবে নানামুখী ইতিবাচক পরিবর্তনকে সমর্থন দিয়ে আগামীর অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরকে আরো গতিময় করা। পাশাপাশি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য নীতি সমন্বয় ও পুরো প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ ও মনিটরিংও নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশাবাদী যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবার আগেই (অর্থাৎ ২০২৫ সালের মধ্যেই) পরিবর্তনের এই ধারা আরো জোরদার হবে এবং আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাব।

তথ্যসূত্র

১. ড. আতিউর রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভিযাত্রা' শিরোনামের বিশেষ বক্তৃতা থেকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিবদের জন্য ১৩১তম এসিএডি কোর্স উপলক্ষে ৪ঠা জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দেওয়া।

২. ড. আতিউর রহমান রচিত 'বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক *ইত্তেফাকে* ১৫ই আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত।

৩. ড. আতিউর রহমান রচিত 'বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই হাঁটছি আমরা' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক *যুগান্তরে* ১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত।

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-১৯৭৮', জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন।

৫. আবুল কাশেম রচিত 'বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং শিল্পের বিকাশ' নিবন্ধ থেকে। *বঙ্গবন্ধু নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ক-নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন-*

এর পৃষ্ঠা ৪১ থেকে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৮।

৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০-এর পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট থেকে। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০।

৭. ড. আতিউর রহমান রচিত 'মন্দা মোকাবিলায় শক্তি জোগাচ্ছে আধুনিক কৃষি' নিবন্ধ থেকে। *আমাদেরসময়.কম*-এ ১৬ই অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত।

৮. ৬ নম্বর তথ্যসূত্রের অনুরূপ

৯. বিশ্ব ব্যাংকের 'Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ, ওয়াশিংটন ডিসি, ২০২০।

১০. ৬ নম্বর তথ্যসূত্রের অনুরূপ

১১. ড. আতিউর রহমান রচিত 'অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও আগামীর অর্থনীতি' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক *সমকাল*, ২৩শে জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত।

১২. কৌশিক বসু রচিত 'Why is Bangladesh booming?' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক *ডেইলি স্টার*, ২৭শে এপ্রিল ২০১৮-এ প্রকাশিত।

১৩. ড. আতিউর রহমান রচিত 'Investment Climate for an Upper Middle Income Bangladesh' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে। বিইএফ সম্মেলন ২০১৯ উপলক্ষে উপস্থাপিত, জানুয়ারি ২০২০।

১৪. Household Income and Expenditure Survey 2016, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৫. ড. আতিউর রহমান রচিত 'Bangladesh: From ashes to prosperity' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ২১শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত।

১৬. Human Development Report 2019. Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in the 21st Century. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)।

১৭. দৈনিক *ঢাকা ট্রিবিউনের* 'Covid-19 resilience: Bangladesh among top 20 nations' শীর্ষক ডেস্ক প্রতিবেদন থেকে। দৈনিক *ঢাকা ট্রিবিউন*, ২২শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত।

১৮. ড. আতিউর রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভিযাত্রা' শিরোনামের বিশেষ বক্তৃতা থেকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিবদের জন্য ১৩১তম এসিএডি কোর্স উপলক্ষে ৪ঠা জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দেওয়া।

১৯. ড. আতিউর রহমানের সাক্ষাৎকার, 'কৃষক ও কৃষিই আমাদের রক্ষা করে' শিরোনামে। দৈনিক *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৯ই জুলাই ২০২০ তারিখে প্রকাশিত।

২০. 'Mobile money in the COVID-19 pandemic' শিরোনামে দৈনিক *দি ডেইলি স্টার*-এর প্রতিবেদন থেকে, ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত।

২১. সানাউল্লাহ সাকিবের 'বিকাশেই মিলবে সিটি ব্যাংকের অতি ক্ষুদ্র ঋণ' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। দৈনিক *প্রথম আলো*, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত।

২২. মেহেদী হাসানের 'Pandemic makes agent banking deliver on its great potential' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। দৈনিক *ঢাকা ট্রিবিউন*, ১৬ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত।

২৩. 8th Five Year Plan July 2020-June 2025: Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ২০২০।

২৪. এস. কাঠুরিয়া রচিত 'Bangladesh Corridor Vital to India's 'Act East' Policy ' নিবন্ধ থেকে, বিশ্ব ব্যাংক ২০১৭।

২৫. ইউএনএফপিএ-এর অনলাইন তথ্য ভাণ্ডার থেকে। সূত্র: Source: https://www.unfpa.org/data/demographic-dividend/BD

২৬. জেড. মুনির, ও. মুয়েহলস্টেইন এবং ভি. নাউভার রচিত 'Bangladesh the Surging Consumer Market Nobody Saw Coming' নিবন্ধ থেকে। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ, ২০১৫।

২৭. জেড. এ. পলকের 'By 2030, Bangladesh will be the 24th Largest Economy. Here's How ICT is Driving that Growth. World Economic Forum' নিবন্ধ থেকে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে ২০১৯ সালে উপস্থাপিত।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ অন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

বঙ্গমাতা জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও পদক প্রদান

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গমাতা জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও পদক প্রদান অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ৭ই জুলাই ভার্চুয়ালি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিবসকে 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া বঙ্গমাতার অবদান চিরস্মরণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক নারীদের জন্য 'ক' শ্রেণিভুক্ত সর্বোচ্চ জাতীয় পদক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবারই প্রথম ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হবে। এবছর দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী'।

এ দিবসে ৮টি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বোচ্চ ৫ জন বাংলাদেশি নারীকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান করা হবে। পদকপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে আঠারো ক্যারেট মানের চল্লিশ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ পদক, পদকের রেপ্লিকা, চার লাখ টাকা এবং সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। দিবসটি উপলক্ষে সারা দেশে দুই হাজার দুস্থ ও অসহায় নারীকে নগদ দুই হাজার টাকা করে মোট ৪০ লাখ টাকা এবং চার হাজার সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। এছাড়া সড়ক ও সড়ক দ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বাংলা ও ইংরেজিতে পোস্টার তৈরি ও বিতরণ, বঙ্গমাতার জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ডিজিটাল শুভেচ্ছা কার্ড বিতরণ এবং মোবাইলে এসএমএস প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : আবিদ হোসেন

করোনা মহাদুর্যোগে বাংলাদেশের অর্থনীতি

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

বর্তমানে করোনাভাইরাসের বহুরূপী আক্রমণাত্মক প্রভাবের কারণে বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও হচ্ছে। করোনা দুর্যোগের কারণে এবারে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটকে জীবন-জীবিকার বাজেট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে বাজেটে প্রস্তাবনার প্রাক্কলন অর্জন করতে হবে এবং এজন্য একান্ত প্রয়োজন হবে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এখনো দুর্বলতা আছে। ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে মাত্র ২৫ লাখ করদাতা কর দেন। অথচ গত ১০ বছরে আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। ধনীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত আট মাসে জুলাই–ফেব্রুয়ারিতে আদায় হয়েছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা সে হিসাবে বাকি চার মাসে আদায় করতে হবে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা, যা করা খুব কঠিন। উন্নত বিশ্বের মতো রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়িয়ে দেশের ধনিকশ্রেণি ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের উচ্চ আয়ের গোপনীয়তা রোধ করে সঠিকভাবে কর আরোপ করতে হবে। আমাদের করের আওতা বৃদ্ধি, রাজস্ব বোর্ডের সুশাসন নিশ্চিত করে বর্তমানে কর জিডিপি'র অনুপাত ১০ শতাংশের পরিবর্তে উন্নত বিশ্বের মতো ৩০ শতাংশের মতো আহরণ করা সম্ভব। উন্নত বিশ্বের মতো রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়িয়ে সঠিকভাবে কর আরোপ করতে হবে। ব্যক্তির সম্পদের সঠিক হিসাব করে কর ফাঁকি বন্ধ করতে হবে। তবে কোনোভাবে করদাতাদের হয়রানি করা যাবে না। তাহলে রাজস্ব আয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং বাজেটের প্রাক্কলন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে আইনের শাসন এবং জবাবদিহির মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।

কালো টাকাকে শর্তসাপেক্ষে সাদা করাকে মন্দের ভালো বলা যেতে পারে। তবে অর্থনীতিতে বিশেষ করে আবাসন খাতে নৈরাজ্য বন্ধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের আয়ের উৎস ও আয় প্রদর্শন না করার কারণ দেশের কল্যাণে জানতে হবে।

২৯শে মার্চ ১৯৭২ চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ধনীদের তিনি আরো ধনী হতে দেবেন না। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের দেশ। শিল্পপতিদের জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশের আয় বৈষম্য বেড়েই চলছে, ধনীরাই ধনী হচ্ছে। এই দুর্যোগে দুখি মানুষের সেবায় তাদের তেমন বড়ো রকমের ভূমিকা দেখা যায় না অথচ নানা অজুহাতে সরকার থেকে নানা প্রণোদনা নিচ্ছেন নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ই জুলাই ২০২১ প্রবাসী কর্মীদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ– পিআইডি

করোনা দুর্যোগের কারণে বিশ্বব্যাপী জীবিকার ওপর মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে, আমাদের দেশের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়েছে। অনেকে কাজ হারিয়ে বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন আবার অনেকে দেশের অভ্যন্তরে মোট চাহিদার ব্যাপক হ্রাসের কারণে কাজ হারিয়েছেন। সরকারকে জনগণের জীবনরক্ষায় টিকা সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে, আবার স্বাস্থ্য খাতের বিদ্যমান কিছু অনিয়ম দূর করে করোনাকালীন বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। জনগণকে সচেতন করা এবং সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সরকার যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিরোধী দলের গঠনমূলক আচরণ প্রত্যাশিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভারত থেকে চুক্তিকৃত যে পরিমাণ অক্সফোর্ড টিকা পাওয়ার কথা ছিল তার নিজের দেশে স্বাস্থ্য খাতে বিপর্যয়ের কারণে সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে টিকা সংগ্রহ করছে। এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তবে আশাব্যঞ্জক হলো বিদেশি দাতা সংস্থা ও দাতা দেশগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে ডেল্টা ধরন করোনা আক্রমণে সীমান্ত এলাকায় ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি দেশে উৎপাদন ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা হতো এতদিনে আমাদের দেশে টিকা তৈরি, অক্সিজেনসহ জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে সক্ষম হতো। এ কারণে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার ওপর বেশি জোর দিতে হবে।

এই করোনা দুর্যোগের বছরে স্বাস্থ্যের ওপর নজর দিতে হবে। একইসঙ্গে কৃষি, বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পের ওপর এবং শিক্ষিত বেকার ও দিনমজুরদের ওপর অর্থাৎ সব বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

যেমন কৃষকদের দুঃসময়ে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ধান কাটা-মাড়াইসহ বস্তাজাতকরণে কৃষক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সংগঠনের কর্মীরা কৃষকদের পাশে থেকে সহযোগিতা করেছিল। অন্যদিকে সরকারের উদ্যোগে বিশেষ ট্রেন ও পোস্ট অফিসের ফিরতি গাড়িগুলোর মাধ্যমে আম বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ঠিক এভাবে মাঝারি, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে যেন ব্যাংক ও ধনী ব্যক্তিরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়ে আসে সে দিকেই সরকারের বিশেষ নজর দিতে হবে। তাহলে অনেক শিক্ষিত বেকার আর্থিক প্রণোদনা ও সহজ ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। কৃষিতে ও মৎস্য শিল্পে প্রণোদনার মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। এই কার্যক্রমের পরে সরকারকে অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে শিক্ষা খাতে, যোগাযোগ খাতসহ অন্যান্য খাতে বিশেষ করে পদ্মা সেতু, রেল প্রকল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে যার ফলে কর্মসংস্থান চলমান থাকবে। এই দুর্যোগে নতুন প্রকল্পের পরিমাণ কমিয়ে সে অর্থ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেট বাবদ বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা খাতে উন্নত বিশ্বের মতো কমপক্ষে জিডিপি'র ৬ শতাংশ বরাদ্দ দিতে হবে। গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দেশীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। দেশের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। কৃষি-শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে উন্নত বিশ্বের মতো ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রসমাজকে সচেতন করতে যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক বিষয়ে দেশের সঠিক ইতিহাসের পাশাপাশি গণিত-বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের লক্ষ্যে সিলেবাসের ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। বাংলা-ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান আহরণে সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সবাইকে যোগ্য মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে। দেশের অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত বেকারদের প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আরো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে কিংবা ট্রেনিংপ্রাপ্ত মানবসম্পদ রপ্তানি করে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নতি করতে হবে এবং বিদেশে পাঠিয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সৎ ও পণ্ডিতব্যক্তিদের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। কিন্তু উপাচার্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটির কারণে কোনো কোনো উপাচার্য নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন, যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায়। আবার কোনো কোনো সাংবাদিক উপাচার্যের দুর্নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষকসমাজকে নিয়ে এমন নেতিবাচক মন্তব্য করেন, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। কোনো উপাচার্যের জন্য শিক্ষকসমাজ বিব্রত বোধ করেন– তাও কাম্য নয়। অতএব বঙ্গবন্ধুর মতো নির্লোভ, বিজ্ঞ শিক্ষকদের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এমন অনিয়মের বিষয়গুলো বিচক্ষণ গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে তদন্ত করা প্রয়োজন। আইনের শাসন সবার জন্য কঠিনভাবে প্রয়োগ করা খুবই জরুরি।

দেশের কৃষি, শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা খাত থেকে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সরবরাহের প্রচেষ্টা চলছে। মানব সম্পদকে পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য শিক্ষা খাতকে আরো ঢেলে সাজাতে হবে।

যোগাযোগ খাতে অপচয়ের মাত্রা বেশি। প্রকল্পের সময় বারবার বৃদ্ধি করে আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ উন্নত বিশ্বের চেয়েও বেশি হয়ে যায়। এ বিষয়েও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি আমাদের অন্যতম খাত, যা প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করে আমাদের দৈনন্দিন ক্ষুধা নিবারণ করছে। কৃষকরা প্রণোদনার মাধ্যমে অধিক ফসল ফলাচ্ছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের গরিব কৃষকদের শোষণ বন্ধ করতে এবং বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আরো প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের হাওরগুলোকে মৎস্য উৎপাদনের কাজে লাগাতে সরকার গ্রহণ করেছে নানা উদ্যোগ। পোল্ট্রি খামারে ও কৃষি খামারে (ফলদ ও বনজসহ) শিক্ষিত বেকারদের আরো ট্রেনিং দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে সরকার।

বিশ্লেষণে মনে হচ্ছে, যেন স্বাস্থ্য ও রাজস্বসহ কিছু খাতের দেখভাল করার দায়িত্ব শুধুই প্রধানমন্ত্রীর। তাও আবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গোপন রাখার চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে পড়লে, জানতে পারলে স্বাস্থ্য খাতসহ কিছু খাতের দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ পায় এবং তখন সংশ্লিষ্ট লোকদের দোড়ঝাঁপ করতে দেখা যায়। স্বাস্থ্য খাত থেকে শুরু করে কিছু খাতে এই অবস্থা বিরাজমান। তাই এসব খাতের যথাযথ মনিটরিংয়ের জন্য সৎ, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং সেল থাকা উচিত। এতে প্রধানমন্ত্রীর পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা কমবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রত্যাশা করি, বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাকালীন সংকট মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পারবেন।

টিকা যেভাবে আসছে এবং দেওয়া হচ্ছে তাতে শতকরা বেশির ভাগ মানুষকে টিকার আওতায় আনতে এবং সংক্রমণ ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে অনেক সময় লেগে যাবে। এতদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা যাবে না, তাই চলমান টিভি প্রোগ্রামকে আরও উন্নত করতে হবে, গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে এবং অনলাইনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু করে দিতে হবে। এজন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেটের সুযোগ করে দিতে হবে। আশার কথা, শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। এরপর স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে।

ঢাকা কিংবা বিভাগীয় শহর থেকে গ্রামকেন্দ্রিক ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান কমিউনিটি ক্লিনিককে চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের নাগালে নিয়ে যেতে হবে বিশেষ করে করোনা সংক্রান্ত জরুরি সেবাগুলো, টিকা কর্মসূচি, ঔষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সেবাগুলো জনগণের প্রয়োজনে কমিউনিটি ক্লিনিকে থাকতে হবে।

বর্তমানে করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশ্বের সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও লকডাউন অনুসরণ করে জীবন-জীবিকার সমন্বয় করতে হচ্ছে। বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী লকডাউনের পরিকল্পনা করতে হবে। লকডাউন সময়ে দিনমজুরসহ দুস্থ গরিবদের ডাটাবেজ তৈরি করে মোবাইল ব্যাংকিং বা মোবাইল সেবার মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম অর্থ সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে পৌঁছাতে হবে।

ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঈদ উপলক্ষে করোনা দুর্যোগে সবার জীবনযাপন সহজতর করার লক্ষ্যে ৫টি প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন যা খুবই প্রশংসনীয়। প্রণোদনা বণ্টনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট একাধিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে বণ্টন ও সামাজিক বিধি মানার বিষয়ে বিশেষ করে অসচেতন, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে। কেননা কিছু ব্যক্তিদের মাস্ক না পরার কারণে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করি সরকার প্রণোদনার পাশাপাশি অতিদ্রুত অধিকাংশ জনগণের টিকার ব্যবস্থা করে দেশের অর্থনীতির চাকা, সামাজিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনতে সক্ষম হবে।

এই করোনা মহামারিতে সমালোচনা বাদ দিয়ে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ধনিকগোষ্ঠী ও জনপ্রতিনিধি সবাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এলাকা ভিত্তিতে দিনমজুর ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে যেন কোনো এলাকার কেউ অনাহারে মারা না যায় কিংবা অর্ধাহারে কষ্ট না পায়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে এগিয়ে এসে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মতো।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুলাই ২০১৮ গণভবনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন ভাতার অর্থ ইলেকট্রনিক (G2P) উপায়ে বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক সুরক্ষা ও বাজেট

প্রণব মজুমদার

দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা গরিব মানুষের সামাজিক সুরক্ষার প্রসঙ্গ যখন ওঠে, তখন দৃষ্টি যায় গ্রামাঞ্চলের দিকে। কৃষিপ্রধান এ দেশের অধিকাংশ মানুষের বাস গ্রামাঞ্চলে। দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলেই বেশি, সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনও সেখানে বেশি। কিন্তু তাই বলে শহর-নগরে দরিদ্র মানুষ নেই এমনটা ভাবাও ঠিক নয়। সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন তাদেরও।

বাংলাদেশে অর্থনীতির আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের হারও কমে আসছে, এটি আশার কথা। শহরে বসবাসকারী দরিদ্রদের মাত্র ১৭.৮৪ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকারি সহায়তা পেয়ে থাকে, যেখানে গ্রামাঞ্চলে ৩৫.৭৭ শতাংশ দরিদ্র মানুষ এই সুবিধা ভোগ করে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১০-২০১৬ সালে শহরের দারিদ্র্যে হার ২১.৩ থেকে কমে ১৯.৩ শতাংশে নেমেছে। কিন্তু অতিদারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশ। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হার কমেছে ৮.৫ শতাংশ। অর্থাৎ শহরাঞ্চলে অতিদরিদ্রদের সংখ্যা আরও বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের বরাদ্দ যেমন বেশি, তেমনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও অনেক বেশি সক্রিয়। সে তুলনায় শহরাঞ্চলে তাদের কার্যক্রম কম।

বিশ্বব্যাংক স্বীকার করেছে যে, ২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। ২০১০ সালে যেখানে দরিদ্রের হার ৩০ শতাংশের ওপর ছিল, সেখানে তা ২১ শতাংশে নামিয়ে আনা প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০-২০১৬ সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনের ৯০ শতাংশই হয়েছে গ্রামে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য কমুক, সেটা আমরাও চাই। কিন্তু শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে কিংবা অতিদরিদ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকলে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কোনো সুফল দেবে না। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ৬৫ শতাংশ ও শহরে ৩৫ শতাংশ মানুষ বাস করে। অদূর ভবিষ্যতে শহর ও গ্রামের জনসংখ্যার ফারাক আরও কমে যাবে।

২০১৪ সালে যে বস্তি শুমারি হয়েছিল, তাতে জানা গিয়েছিল বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বস্তির সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ছিল ২ হাজার ৯৯১। আর ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩ হাজার ৯৯৫। আজ থেকে ৮ বছর আগেই বস্তিবাসী জনসংখ্যা ২২ লাখ ৩২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১০ লাখ ৩২ হাজার ছিলেন নারী। তাদের মধ্যে ৫ শতাংশ ছিলেন বিধবা। তারপর আট বছর পেরিয়েছে; এই প্রতিটি সংখ্যা কতটা বেড়েছে, সে সম্পর্কে কোনো হালনাগাদ পরিসংখ্যান নেই। শহরাঞ্চলের এসব বস্তিবাসীর মানুষ নানা পন্থায় আয়রোজগার করে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন; কিন্তু নিয়মিত আয়রোজগার নেই, বয়স ও স্বাস্থ্য কাজ করার উপযোগী নয়, এমন অনেক মানুষ আছেন, বিশেষত নারী আছেন, যাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রয়োজন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) এক প্রতিবেদনের এক তথ্য। সে অনুসারে এশিয়ার ২৫টি দেশের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম নিয়ে 'দ্য সোশ্যাল প্রোটেকশন ইন্ডিকেটর ফর এশিয়া- অ্যাসেসিং প্রোগ্রেস' শীর্ষক প্রতিবেদনটি ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচের দিক থেকে বাংলাদেশ এশিয়ার নিচের দিককার পাঁচটি দেশের একটি। বাংলাদেশের পেছনে আছে শুধু মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভুটান ও লাওস। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২১তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র ১ দশমিক ২ শতাংশ পরিমাণ আর্থসামাজিক সুরক্ষায় খরচ করে বাংলাদেশ। তালিকার শীর্ষে থাকা জাপান খরচ করে জিডিপি'র ২১ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশে নারীদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি সুরক্ষা পান। আবার সামাজিক সুরক্ষার জন্য গরিব মানুষের পেছনে যতটা খরচ হয়, এর চার গুণ বেশি খরচ হয় ধনীদের পেছনে।

এডিবি'র প্রতিবেদন ধরে জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করা যাক। জাপানে গরিব লোক নেই বললেই চলে। তবু সব নাগরিককে তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একটি সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা দেয় জাপান। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের চেয়ে ৩৬৪ গুণ বেশি অর্থ খরচ করেছে জাপান। বাংলাদেশের মাত্র ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ সামাজিক সুরক্ষার কোনো না কোনো সুবিধা পান।

দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সুবিধার আওতায় সরকার বিধবা ভাতা, দরিদ্র নারীদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এছাড়া টেস্ট রিলিফ, 'ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং' (ভিজিডি), কাজের বিনিময়ে টাকাসহ (কাবিটা) বিভিন্ন কর্মসূচিও আছে।

গত ১০ বছরে সামাজিক সুরক্ষায় সরকার খরচ বাড়িয়েছে প্রায় তিন গুণ। প্রতিবছরই সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও ভাতা বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যা জিডিপি'র ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপি'র অনুপাতে সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। যেমন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলতি অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ জিডিপি'র ২ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা।

করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাবে বহু মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাওয়ায় জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। একই সঙ্গে সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ঢুকতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে যত দ্রুত সম্ভব একটি ডাটাবেজ তৈরির তাগিদ দিয়েছেন তারা।

জাতীয় বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতে মোট জিডিপি'র চার শতাংশ বরাদ্দ করার প্রস্তাব করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

কোভিড মহামারিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে পেনশন, সুদ, কৃষি ভরতুকি বাদ দিলে গরিবের জন্য প্রকৃত অর্থে বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ১,৮৭৮ কোটি টাকা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের মোট বরাদ্দের প্রায় ৩৯ শতাংশ খরচ হবে সরকারি কর্মকর্তাদের পেনশন, সঞ্চয় সুদ ও কৃষি ভরতুকিতে।

গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ২ দশমিক ১ শতাংশ বা ৬৪ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তায়। আর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে গরিব মানুষের জন্য খরচ হবে জিডিপি'র ১ দশমিক ৯ শতাংশ বা ৬৬ হাজার ৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ কোভিডের প্রেক্ষাপটেও সামাজিক নিরাপত্তায় পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে ১ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা।

জাতীয় বাজটে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন করে দরিদ্রপ্রবণ ১৫০ উপজেলাকে শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাবেন নতুন আরও ৮ লাখ মানুষ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তিনি এই খাতে ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চেয়ে ১২ হাজার ৩৬ কোটি টাকা বেশি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটের ১৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ অর্থ। এই অর্থ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩ দশমিক ১১ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ধরা হয়েছে ৩৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪০ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ছিল বাজেটের ১৬ দশমিক ৮৩ আর জিডিপি ৩ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে এই খাতে সরকার প্রতিবছর বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে। এসময় তিনি টেনে আনেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এ. বি. মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলামের উপস্থাপিত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রসঙ্গ। মির্জ্জা আজিজের ওই বাজেটের ১৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ বরাদ্দ ছিল সামাজিক নিরাপত্তা খাতে। সেই হিসাবে ১৩ বছরে এই খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১৩৪টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ। এর মধ্যে ভাতা হিসেবে রয়েছে নয়টি। এগুলো হচ্ছে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, বেদে, রূপান্তরিত মানুষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও সরকারি কর্মচারীদের পেনশন। এগুলোতে ব্যয়

হবে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে পেনশনের অংশই প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।

বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বেশি দরিদ্রপ্রবণ ১১২টি উপজেলার দরিদ্র শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতারা ভাতার আওতায় রয়েছেন। এবার আওতায় আসছে আরও ১৫০টি উপজেলা। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা পান ৪৯ লাখ জন এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা পান ২০ লাখ ৫০ হাজার জন। নতুন করে বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাবেন ৮ লাখ এবং সোয়া ৪ লাখ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মানুষ।

এছাড়া বর্তমানে ১৮ লাখ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন। চলতি অর্থবছরে এই সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৮ হাজার জন বাড়বে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতাও বেড়েছে। বর্তমানের ভাতা বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবে মুক্তিযোদ্ধারা পাচ্ছেন এ সুরক্ষা ।

এদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে অর্থ বিভাগের তৈরি তালিকায় দেখা যায়, 'খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসৃজন কর্মসূচি' উপ-শিরোনামের আওতায় টিআর, জিআর, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি সাতটি বিষয়ে ১৫ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। আর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বাবদ ছয়টি আলাদা হিসাবে দেখানো হয়েছে ৪ হাজার ২৭৩ কোটি টাকার বরাদ্দ।

এছাড়া নগদ ও খাদ্য সহায়তা সংক্রান্ত ১৭টি বিষয়ে ২০ হাজার ১৮২ কোটি, ঋণ সহায়তার চারটি বিষয়ে ১ হাজার ১৭৭ কোটি, বিশেষ সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ১২টি বিষয়ে ৫৯২ কোটি, নয়টি বিভিন্ন তহবিল ও কর্মসূচিতে ১২ হাজার ৯৪ কোটি, ৩৫টি উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০ হাজার ৩৬৬ কোটি এবং ১৭টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অধিকতর কার্যকর করতে ২০১৫ সালে সরকার পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারিতে এনএসএসএস-এর একটি মধ্যবর্তী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বড়ো বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুন ২০২১ জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে বিশেষ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্থ বিলে স্বাক্ষর করেন– পিআইডি

সাহসী ও সময়োপযোগী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

এম এ খালেক

জাতীয় সংসদের জুন সেশনের দ্বিতীয় কর্মদিবসে ৩রা জুন বিকেলে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাষ্ট্রীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। করোনাকালীন অবস্থায় বাজেট নিয়ে বিভিন্ন মহলে আগ্রহের অন্ত ছিল না। বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী করোনাকালে কেমন বাজেট উপহার দেন তা জানতে সবাই উৎসাহী ছিলেন। এটা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পঞ্চাশতম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট হিসাব ধরলে একান্নতম বাজেট। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের এটা ত্রয়োদশ ধারাবাহিক বাজেট এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মুস্তফা কামালের উপস্থাপিত তৃতীয় বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেট নানা কারণেই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো সরকার ধারাবাহিকভাবে ১৩টি বাজেট উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। সে হিসেবে এটি একটি অনন্য রেকর্ড।

উল্লেখ্য, একটি সরকারের ধারাবাহিকতা না থাকলে সেই সরকারের পক্ষে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে আর্থসামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে তিন মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে বলেই বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ইতঃপূর্বে যতগুলো বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে তার কোনোটিই সম্ভবত এবারের বাজেটের মতো জটিল এবং কঠিন ছিল না। করোনার কারণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে চরম মন্দাবস্থা বিরাজ করলেও আগামী অর্থবছরের জন্য যে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে তা এযাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ বাজেট। বিশেষ করে বাজেটের আর্থিক আকার আগের যে-কোনো বাজেটের চেয়ে বেশি। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। প্রস্তাবিত বাজেটে করোনার কথা বিবেচনায় রেখে 'জীবন ও জীবিকা'র ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সময়োপযোগী ও কার্যকর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া জোরদার করার মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসৃজন, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং দারিদ্র্য বিমোচনই এবারের বাজেটের মূল উদ্দেশ্য। করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যয় কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি, করপোরেট কর হ্রাস, স্থানীয় কিছু শিল্পকে বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি কার্যকর উন্নত দেশে পরিণত করাই প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্য। এজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বাজেটে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি জাতির পিতার তুলিতে আঁকা স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাবে অনেক দূর, বহুদূর, নিরন্তর। তিনি আরো বলেন, বাঙালি বীরের জাতি। তারা যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে জানে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশিত পথে বাংলাদেশ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা করে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গত, অর্থমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কিছু চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে গত ১২ বছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬ দশমিক ৬ শতাংশ। যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে যায়। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার, যা এ বছর ২ হাজার ২২৭

মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে দারিদ্র্যের হার ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে। জিডিপি'র আকার একই সময়ে ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা থেকে ২৮ লাখ কোটি টাকা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেট বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো আকারের বাজেট। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাবনা করা হয়েছে তার সার্বিক আকার হচ্ছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বাজেটের আকার জিডিপি'র ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিক ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ দেখনো হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৩ শতাংশে সীমিত রাখা হবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এক শতাংশ কমানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য বলেন, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব।

উল্লেখ্য, ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু তাঁর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, আগামীতে করোনা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতিতে তিনটি দেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকবে। দেশ তিনটি হচ্ছে– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহও ইতঃপূর্বে আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ এ বছর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। কাজেই অর্থমন্ত্রী যে বলেন জিডিপি প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে যেতে পারে, কথাটি একেবারে অমূলক নয়। করোনার কারণে ভারতের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে সংকুচিত হলেও বাংলাদেশ তার প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু জিডিপি ভারতের জনগণের মাথাপিছু জিডিপি'কে অতিক্রম করে গেছে। সামাজিক অনেক সূচকেই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করাটা খুবই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিকভাবে কোনো দেশের বাজেটে জিডিপি'র ৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতিকে সহনীয় বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে এই ঘাটতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের আগে বাংলাদেশের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ কোনো বছরই ৫ শতাংশের বেশি হয়নি। করোনাকালীন অবস্থায় বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা বেশি হয়েছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে এই বিপুল ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হবে।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এখনো শীর্ষে রয়েছে পণ্য ও সেবা রপ্তানি খাত। বাংলাদেশ সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হবার জন্য চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হবে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি সুবিধা হারাবে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৬০ শতাংশই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে যায়। অবশ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়েছে তারা ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা দেবে। আগামীতে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে বাংলাদেশি পণ্যকে বাইরের দুনিয়ায় ব্র্যান্ডিং করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো ১০ বছরের জন্য কর মওকুফ সুবিধা পাবে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে তৈরি পোশাক। কিন্তু এই তৈরি পোশাক বিদেশি আমদানিকৃত কাঁচামালনির্ভর। ফলে এই খাত থেকে প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার একটি বড়ো অংশই আবার কাঁচামাল আমদানিতে বাইরে চলে যায়। উপার্জিত অর্থের মধ্যে মাত্র ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর পণ্য বেশি বেশি করে রপ্তানি তালিকায় স্থান দিতে না পারলে এই সমস্যা থেকে কোনোভাবেই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ৩রা জুন ২০২১ জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে জুন ২০২১ জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন– পিআইডি

উত্তরণ ঘটানো যাবে না। বিশেষ করে আমাদের এমন সব শিল্প গড়ে তুলতে হবে যার কাঁচামাল আসবে কৃষি সেক্টর থেকে। স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতির উপর ব্যাপক হারে ভরতুকি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে কৃষক এবং কৃষি ব্যবস্থা উপকৃত হবে। কৃষি খাতে উৎপাদিত কাঁচামালনির্ভর শিল্প স্থাপনের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ভালো, আগামীতে আরো ভালো হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি চমৎকার সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ।

বাংলাদেশ এতদিন আমদানিনির্ভর দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। আমরা আগামীতে বাংলাদেশকে রপ্তানিমুখী দেশে পরিণত করব। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরো একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আমরা যেসব দেশ থেকে বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানি করি, সেই সব দেশে আমাদের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করা হয়। অথচ এই দুটি অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের পণ্য আমদানির পরিমাণ খুবই কম। আবার চীন এবং ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করলেও এই দুটি দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই অসঙ্গতি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীতে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' নামে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম সফল হলে বাংলাদেশ অবশ্যই একটি রপ্তানিনির্ভর দেশে পরিণত হতে পারবে।

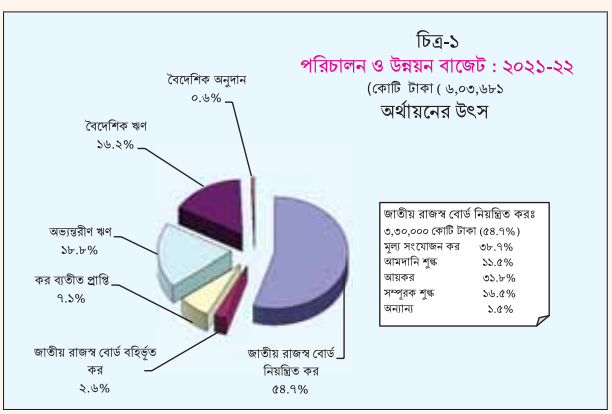

অর্থমন্ত্রী তার প্রণীত বাজেটে শিল্প খাতের জন্য ব্যাপক কর ছাড় দিয়েছেন। এটা করা হয়েছে স্থানীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে। আগামীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা আরো তীব্র হবে। সেখানে কারো করুণা নিয়ে টিকে থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাই আমাদেরকে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে নিজস্ব যোগ্যতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকা যায়। এজন্য স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ওপর জোর দিতে হবে। সরকার সেই প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেছে।

এক সময় বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংকটে ভুগতো। এখন বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংরক্ষণ করছে। বাংলাদেশের বর্তমান রিজার্ভের পরিমাণ ৪৫ বিলিয়ন (৪ হাজার ৫০০ কোটি) মার্কিন ডলার। এটা সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রিজার্ভ। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ কিছু দিন আগে শ্রীলংকাকে ২০ কোটি মার্কিন ডলার ধার দিয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই

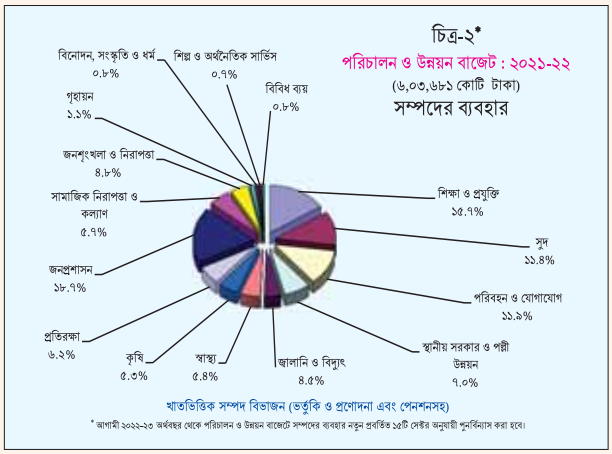

প্রথম। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এই স্ফীতির পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে জনশক্তি রপ্তানি খাত। গত অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী আয়ের ওপর নগদ ২ শতাংশ হারে আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। একই সঙ্গে রেমিটেন্স প্রেরণের ফর্মালিটিজ অনেকটাই কমানো হয়েছে। এসব কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বর্ধিত হারে রেমিটেন্স প্রেরণ করছে। গত মে মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মোট ২১৭ কোটি মার্কিন ডলার রেমিটেন্স প্রেরণ করেছে। এ নিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে মোট ২ হাজার ২৮৪ কোটি মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে এল। এই অবস্থা বজায় থাকলে চলতি অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ প্রথমবারের মতো আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার অতিক্রম করে যেতে পারে। চলতি অর্থবছরে রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই রেকর্ড সৃষ্টি হতে চলেছে। সরকার বলছে, দুই শতাংশ নগদ আর্থিক প্রণোদনা দেবার কারণেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন আর হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ প্রেরণ করছে না। তাই রেমিটেন্স এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে সহজে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাজেটে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এটা ভালো উদ্যোগ। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, করোনা বাজেটের আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের আয় এবং ভোগ ব্যয় বাড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ মানুষের আয় এবং ভোগ ব্যয় না বাড়লে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। প্রস্তাবিত বাজেটে ভোগ ব্যয় বাড়ানোর জন্য সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

এবার প্রস্তাবিত বাজেটের সাধারণ কিছু সূচকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। প্রস্তাবিত বাজেটের আয়তন বা আকার হচ্ছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটের আকার ছিল ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বাজেটের আকার ৩৫ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা বেড়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ব্যয় বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এটা ছিল ২ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যয় বেড়েছে ২০ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বাস্তবায়নাধীন বাজেটে এটা ছিল ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি বাড়বে ২৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা আগের বছরের মতোই ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায় সীমিত রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় ১০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা মোকাবিলায় ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও সম্মানী বাবদ ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক যাতে তুলনামূলক স্বল্প খরচে কৃষি উপকরণ পেতে পারে সে জন্য কৃষি খাতে ভরতুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ১ লাখ কোটি টাকা অতিক্রম করে যাবে। প্রস্তাবিত বাজেটে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা পেশাচ্যুত এবং কর্মচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ ৯৪ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৭২ হাজার ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকার গৃহীত ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধ করতে হবে ৬৮ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা। জনপ্রশাসন খাতে ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৭১০ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪২ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। অন্যান্য প্রধান ব্যয়ের খাতগুলো হচ্ছে– ভরতুকি ও প্রণোদনা ৩৫ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা ৩৭ হাজার ২৮১ কোটি টাকা, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ২৮ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, জনশৃঙ্খলা ২৯ হাজার ১২৪ কোটি টাকা, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা, কৃষি ৩১ হাজার ৯১২ কোটি টাকা, অন্যান্য ৪৪ হাজার ১০ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। যেসব খাত থেকে এই আয় আসবে তা হচ্ছে– মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা, আয় ও মুনাফা থেকে কর ১ লাখ ৪ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্ক ৫৪ হাজার ৪৬৫ কোটি টাকা, কর ব্যতীত রাজস্ব আয় ৪৩ হাজার কোটি টাকা, আমদানি শুল্ক ৩৭ হাজার ৯০৭ কোটি টাকা, এনবিআর-এর বাইরের কর ১৬ হাজার কোটি টাকা, এনবিআর-এর অন্যান্য আদায় ৪ হাজার ৯৩১ কোটি টাকা। বাজেটে আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান বা ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার দেশের ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা ঋণ নেবে। বিদেশি দাতাদের নিকট থেকে ঋণ নেওয়া হবে ৯৭ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা। দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ৩৭ হাজার ১ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হবে। বিদেশি অনুদান পাওয়া যাবে ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্ভাব্য আয় থেকে বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হবে তা হচ্ছে– সাহায্য ও মঞ্জুরী ১৯ দশমিক ১ শতাংশ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের বেতন-ভাতা ১৯ শতাংশ,

সরকার গৃহীত ঋণের সুদ ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ, ভরতুকি ও প্রণোদনা ১২ দশমিক ৬ শতাংশ, পণ্য ও সেবা ৯ দশমিক ৯ শতাংশ, পেনশন ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, সম্পদ সংগ্রহে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ, অনুন্নয়ন বিনিয়োগ ৩ শতাংশ এবং অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় হবে অন্যান্য খাতে।

প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক খাতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ভাতার পরিমাণ এবং পরিধি বাড়বে। মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুল্ক হার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বেশ কিছু পণ্যের মূল্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বাড়া-কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এলইডি লাইটের যন্ত্রাংশের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। ফলে বাজারে এলইডি লাইটের মূল্য কিছুটা হলেও কমবে। উৎপাদন পর্যায়ে মুড়ির ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে তাজা ফলের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং যান্ত্রিক মাড়াই কলের ওপর আগাম কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শিল্প ব্যবহার্য লবণের নামে ভোজ্য লবণ আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য শিল্প লবণের উপর কর বাড়ানো হয়েছে। শঙ্খ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কমানো হয়েছে। হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য ১০ বছরের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ ছোটো যান চলাচল নিরুৎসাহিত করার জন্য মাইক্রোবাস ও হাইব্রিড গাড়িতে শুল্ক হার কমানো হয়েছে। মদ-বিয়ার আমদানিতে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই খাতে ২০ শতাংশ অগ্রিম করারোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশক ও ডিলার পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করায় সেনিট্যারি ওয়্যার এবং টাইলসের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। যেসব পণ্যের ওপর ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে তার কোনোটিই নিত্যপণ্য নয়। কাজেই এতে সাধারণ মানুষের কোনো কষ্ট হবে না।

প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'তে বরাদ্দ বর্তমান অর্থবছরের চেয়ে ব্যয় বেড়েছে ২০ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি যার আবশ্যকতা নেই। তবে চলমান মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

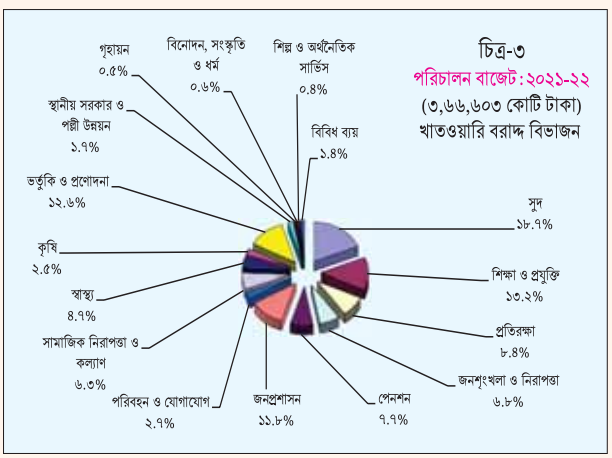

জাতীয় বাজেট ২০২১-২০২২	
বাজেট	৫১তম (অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটসহ)
বাজেট ঘোষণা	৩রা জুন ২০২১
বাজেট ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল
বাজেট পাস	৩০শে জুন ২০২১
বাজেট কার্যকর	১লা জুলাই ২০২১ থেকে
মোট বাজেট	৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৫%)
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৩,৯২,৪৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৪%; বাজেটের ৬৫.০১%)
রাজস্ব আয়	৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৩%; বাজেটের ৬৪.৫%)
বৈদেশিক অনুদান	৩,৪৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.১০%; বাজেটের ০.৬৫%)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২,২৫,৩২৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৬%; বাজেটের ৩৭.৪%)
মোট ব্যয়	৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৫%) ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিচালন ব্যয় (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়), খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়ন ব্যয়
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২,১১,১৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.১%; বাজেটের ৩৪.৯৯%)
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	২,১৪,৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.২%; বাজেটের ৩৫.৬%)
অর্থসংস্থান	২,১১,১৯১ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	৯৭,৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৯%; বাজেটের ১৬.২%)
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১,১৩,৪৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৩%; বাজেটের ১৮.৮%)
মোট জিডিপি	৩৪,৫৬,০৪০ কোটি টাকা
অনুমিত বিষয়	জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৭.২%
মূল্যস্ফীতি	৫.৩%

স্বাধীনতার পর ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। সেই বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। আর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার হচ্ছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫০ বছরে বাজেটের আকার বেড়েছে ৭৬৮ গুণ। আগামী অর্থবছরে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৩৪ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটা করতে হলে উৎপাদন বাড়াতে হবে ৩ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার।

প্রস্তাবিত বাজেটে দেশের শেয়ারবাজারের জন্য বিশেষ কিছু প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকবে এটা আগে থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল। তাই বাজেট ঘোষণার দিন শেয়ারবাজার চাঙ্গা হয়ে

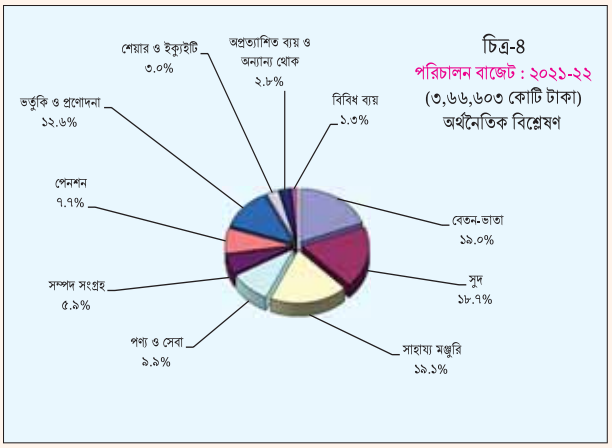

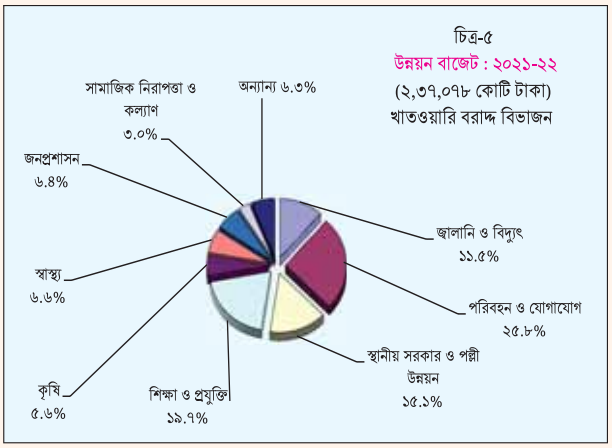

উঠে। ঐদিন ডিএসই-এক্স সূচক ৩৪ দশমিক ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ হাজার ৫৩ দশমিক ৪২ পয়েন্টে উন্নীত হয়। এটা ছিল গত ৪০ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সূচক। এমনকি পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিনে শেয়ার সূচক বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। আগামী অর্থবছর থেকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর হার আড়াই শতাংশ কমিয়ে সাড়ে ২২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এটা ছিল ২৫ শতাংশ। একইভাবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানিকে ৩০ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। আগে এটা ছিল সাড়ে ৩২ শতাংশ। তবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আগের মতোই ৩৭ শতাংশ হারে ট্যাক্স দিতে হবে। তালিকা বহির্ভূত এমন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আগের মতোই ৪০ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হবে। শেয়ারবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির কর হার আড়াই শতাংশ কমানো হয়েছে। এটা শেয়ারবাজারের অবস্থা চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হলে আগের মতোই ৩৭ শতাংশ আর তালিকাভুক্ত না হলে ৪০ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হবে। এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে তাহলো, আমাদের দেশের বেশির ভাগ ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান শেয়ারবাজারে আসতে চায় না। ফলে বাজারে ভালো কোম্পানির শেয়ারের অভাব লক্ষ করা যায়। শেয়ারবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির কর হার কমানোর ফলে অনেক কোম্পানিই এখন শেয়ারবাজারে আসার ব্যাপারে উৎসাহী হবে। হাসপাতাল নির্মাণে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল এবং ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মিত হলে শর্ত সাপেক্ষে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ দেওয়া হবে। বাজেটে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের জন্য কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের মোট কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ১০০ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে নিয়োগ দিলে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য ঐ কর্মচারীদের মোট বেতনের ৭৫ শতাংশ অথবা মোট ট্যাক্সের ৫ শতাংশ যেটি কম তা নিয়োগকারী রেয়াত পাবেন। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কর অবকাশ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়া হতো। এখন সেটা ৭৫ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ব্যাবসাবান্ধব। এজন্যই উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যাপকভাবে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশে যদি ব্যাবসাবাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার না ঘটে তাহলে আগামীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। আর কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। বিশেষ করে করোনাকালীন অবস্থায় যারা কর্মচ্যুত হয়েছেন সেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের তাদের কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। অভ্যন্তরীণভাবে ভোগ চাহিদা এবং ভোগ ব্যয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। আগামী অর্থবছরের বাজেটে সেই দিকটিই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ আগামীতে উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ৪৪তম শক্তি। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ২৬তম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত সাহসী এবং সময়োপযোগী। বাংলাদেশের মানুষ অস্বাভাবিক সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী। তারা সঠিক নির্দেশনা পেলে যে-কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে তার উপযুক্ত স্থান করে নিবে–এটাই সবার প্রত্যাশা।

লেখক: বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

ঈদুল আজহা, হজ ও কোরবানি

মুহাম্মদ ইসমাঈল

বছর ঘুরে ঘুরে আসে ঈদুল আজহা। মুসলিমসমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম এই ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসব দুটি। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। আরবি জিলহজ মাসের ১০ তারিখ পালিত হয় ঈদুল আজহা। বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম আনন্দঘন পরিবেশে ঈদুল আজহার উৎসব পালন করে। মহান আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে তারা আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। ঈদুল আজহার দিন মুসলমানরা একসাথে নামাজ আদায় করে। তারপর আর্থিক সঙ্গতি আছে এমন মুসলমানরা পশু কোরবানি করে। এভাবে ঈদের নামাজ আদায় ও পশু কোরবানির মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াস পান। জিলহজ মাস হজ পালনের মাস। আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলমানগণ এ সময় মক্কা মোয়াজ্জমায় গিয়ে হজ সম্পন্ন করেন। এই ঈদের বড়ো কাজ হলো কোরবানি করা।

কোরবানির ইতিহাস : ঈদুল আজহার দিনে পশু কোরবানি করা ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয়। এই কোরবানির পেছনে রয়েছে গৌরবময় এক ইতিহাস। এই বিশেষ দিনে ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশে অনেক ছাগল ও মেষ কোরবানি করেন। তবে এই কোরবানি আল্লাহ গ্রহণ করলেন না। তাঁকে আবার কোরবানি করতে বলা হলো। হজরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উট কোরবানি করলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এতেও খুশি হলেন না। তিনি বললেন, ইব্রাহিম, তোমার কোরবানি কবুল হয়নি। আল্লাহর নবি ভাবনায় পড়ে গেলেন। তাঁকে আবার বলা হলো : তোমার প্রিয় বস্তু কোরবানি করো। এই আদেশ পেয়ে আল্লাহর নবি মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর ইচ্ছার কোনো কুলকিনারা খুঁজে পেলেন না। ইব্রাহিম (আ.) নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন তাঁর পুত্রকে। কলিজার ধন শিশুপুত্র হজরত ইসমাঈল (আ.)। তাই ইব্রাহিম (আ.) পুত্রকেই কোরবানি করার জন্য মনস্থির করলেন। তিনি পুত্র ইসমাইলকে তাঁর স্বপ্নের কথা খুলে বললেন, হজরত ইসমাইল (আ.) তখন বেশ ছোটো। তবে তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও সমঝদার। হজরত ইসমাইল (আ.) পিতার কথায় হাসিমুখে রাজি হয়ে গেলেন। পিতা ও পুত্রের এই কথোপকথন সূরা সাফফাত-এর ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'অতপর সে (ইসমাইল) যখন পিতার (ইব্রাহিম) সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহিম বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কী? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।' হজরত ইব্রাহিম (আ.) কোরবানির প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে একদিন তিনি মীনায় গিয়ে হাজির হলেন। মাতাপিতা দুজনের মনের গভীরে তখন নীরবে ঝরছে রক্তক্ষরণ। নিজ পুত্রকে আল্লাহর রাহে জবাই করতে হবে! তবে তাঁরা সবাই মহান আল্লাহর অনুগত। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সবই সোপর্দ করতে তাঁরা প্রস্তুত। হজরত ইব্রাহিম (আ.) প্রাণাধিক স্নেহের পুত্রের চোখ বেঁধে কোরবানি দিতে উদ্যত হলেন। আল্লাহর কী কুদরত! আকাশ থেকে এক আওয়াজ এল: 'হে ইব্রাহিম থামো। তোমার আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার পুত্রকে জবাই করতে হবে না। আমি তো কেবল তোমার ইচ্ছার ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করে দেখলাম।' গায়েবি আওয়াজ শুনে হজরত ইব্রাহিম (আ.) থতোমতো খেয়ে গেলেন। এই সময় কুদরতিভাবে আসা একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে গেল। আর ইসমাঈল (আ.) মুক্তি পেলেন। ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনে শেষ পর্যন্ত অটল থাকায় তাঁর কাজে আল্লাহ খুশি হলেন। এ কথাই মহান আল্লাহ পাক সূরা সাফফাতের ১০৪-১০৭ নম্বর আয়াতে বলেন এভাবে–'হে ইব্রাহিম! আপনি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আমি এভাবেই সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে এটা ছিল বড়ো কঠিন পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম জবেহ করার জন্য এক বস্তু দুম্বা।'

হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও আল্লাহভীতির এ মহিমা স্মরণ করে ঈদুল আজহার উৎসব পালিত হয়। সূরা আল-কাউসারের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন– 'সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কোরবানি করুন।'

কোরবানির গুরুত্ব ও ফজিলত : মুসলমানের জন্য অনেক নেক আমল রয়েছে। এসব আমলের মধ্যে কোরবানি একটি বিশেষ আমল। কোরবানির সাথে জড়িত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অনুভূতি। আল্লাহর ভয়ে মুসলমানরা তাঁর এই আদেশ পালন করে। উল্লেখ্য যে, পশু কোরবানি করা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহভীতিই এখানে মুখ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে সূরা হাজ-এর ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 'আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না এর গোশত ও রক্ত, পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।' যে কোরবানির সাথে তাকওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আবেগ জড়িত নেই, আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই কোরবানির কোনো মূল্য নেই। সূরা মায়েদার ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন– 'অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের কোরবানি কবুল করেন।'

কোরবানি করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কোরবানি করে না, তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহর নবি মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– 'মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।'–*ইবনে মাজাহ*। কোরবানির ফজিলত সম্পর্কে হজরত যায়িদ ইবনে আকরাম (রা.) বর্ণিত এক হাদিসে বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ কোরবানি কী? তিনি

বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নাত। তাঁরা (আবার) বললেন, এতে আমাদের কী কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, এর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বকরির পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরির প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে।'

ইবনে মাজাহায় বর্ণিত অন্য এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'যে মুমিন ব্যক্তি প্রশস্ত হৃদয়ে হাসিখুশি মনে সওয়াবের আশায় কোরবানি করবে, আল্লাহ তাআলা তার এ কোরবানিকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ বানিয়ে দেবেন।' *তিরমিযি শরীফে* উল্লিখিত এক হাদিসে মহানবি মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 'কোরবানির দিন আল্লাহর দিন, আল্লাহর কাছে বনি আদমের পশু জবেহ অপেক্ষা অন্য কোনো আমল বেশি পছন্দনীয় নয়। কিয়ামতের দিন কোরবানিকৃত পশু লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত হবে।'

কোরবানি যাদের ওপর ওয়াজিব : বালিগ, মুকিম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) ব্যক্তি ১০ জিলহজ ফজর হতে ১২ জিলহজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব। ওয়াজিব হবার জন্য জাকাতের মতো নিসাব পরিমাণ সম্পদ পুরো এক বছর নিজ আয়ত্তে থাকা শর্ত নয়। বরং যে অবস্থায় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়, ঐ অবস্থায় কোরবানি করাও ওয়াজিব। তবে মুসাফির ব্যক্তির ওপর কোরবানি ওয়াজিব নয়। কোনো মহিলা নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব। নিজের পক্ষ থেকে কোরবানি করা ওয়াজিব। সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব নয়। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তির ওপর শুধু একটি কোরবানি করা ওয়াজিব, যদিও তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হোন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কোরবানি না করাই উত্তম।

কোরবানির শিক্ষা ও করণীয় : পবিত্র ঈদুল আজহা প্রতিবছর আমাদের কাছে ঘুরেফিরে আসে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ পশু কোরবানির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশা করে। এ কোরবানির শিক্ষা কী তা আমাদের জানা দরকার। মনে রাখতে হবে, কোরবানি কেবলমাত্র পশু জবেহ করা নয়, কোরবানি হলো নিজের ভেতরের পশু সত্তাকে জবেহ করা। তার মানে মনের সকল কুপ্রবৃত্তিকে খতম করা। কোরবানির গোশত পেয়ে গরিব-দুখি খুশি হয়। কোরবানি করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ মানার শিক্ষা গ্রহণ করে। কোরবানির দিনে মুসলমানরা এতে অপরের সাথে মিলিত হয়। এদিন ধনী-গরিব কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সবাই সাম্য, ঐক্য, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে হাত মিলায়। বুকে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করে। এতে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি হয়। তাই সবার দরকার কোরবানির যাবতীয় আহকাম মেনে খোদাভীতির মানসিকতা নিয়ে কোরবানি করা। এতে আশা করা যায়, আল্লাহর দরবারে আমাদের কোরবানি কবুল হবে। ফলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হবো।

হজ পালনের আদেশ: ঈদুল আজহার মাস হজ পালনেরও মাস। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম হলো এই হজ। 'হজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা, উপস্থিত হওয়া, মনোনিবেশ করা ইত্যাদি। আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত তারিখে ও যথাযথ নিয়মে কাবা শরিফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ জিয়ারত করাকে হজ বলে। আল্লাহ পাক সূরা আল-ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য রয়েছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য।' এই আদেশের মানে হলো যাদের সংসারের যাবতীয় খরচ চালিয়ে আর্থিক ও দৈহিক দিক থেকে মক্কায় যাতায়াতের ক্ষমতা থাকে তাদের জন্য হজ একটি অবশ্য পালনীয় ইবাদত। হজ পালনের বিষয়ে আল্লাহর নবি মুহাম্মদ (সা.) *মুসলিম শরিফের* এক হাদিসে বলেন, 'হে লোকেরা! তোমাদের ওপর হজ ফরজ করা হয়েছে। অতএব, হজ আদায় কর।'

এখানে উল্লেখ্য যে, কোরবানির সাথেই সংশ্লিষ্ট আরেকটি ইবাদত হলো হজ। মূলত হজের নয়টি ওয়াজিব কাজের মধ্যে কোরবানি অন্যতম। হজের সময় মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইহরাম বেঁধে কাবার তাওয়াফ করেন, সাফা ও মারওয়ায় ছোটাছুটি করেন, আরাফাতের ময়দান ও মুযদালিফায় অবস্থান করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন, শয়তানকে পাথর মারেন এবং কোরবানি করেন। এভাবে ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ পালনের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেন।

হজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা : হজ পালনকারী ব্যক্তি যতই সম্পদশালী হোন না কেন তাকে দুটুকরো সাদা কাপড়ে ইহরাম বাঁধতে হয়। সাদাকালো, উঁচুনিচু ভেদাভেদ পায়ে ঠেলে একই কায়দায় তাকে তাওয়াফ, সাঈ, রমী ও মাথা মুণ্ডন করতে হয়। আরাফাত, মুযদালিফায় একই সমতলে তাকে দিন ও রাত কাটাতে হয়। এতে তাকে অহংবোধ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা চালাতে হয়। হজব্রত পালনকারী ব্যক্তি সবাই পাপ মোচন ও আত্মিক শক্তি অর্জনের একই উদ্দেশ্যে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করেন। হজের সময় বিভিন্ন দেশ ও নানা জাতি এবং বর্ণের লোকেরা একই আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে পরিচয় ঘটার এক মহা সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত হয়। পারস্পরিক মমতা, সৌহার্দ্য ও সাম্যের অনন্য সুযোগ এনে দেয় হজ। পশুবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে হাজিরা আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ জাগ্রত করার পরিবেশ পান হজের মাধ্যমে। ঈদুল আজহার এই দিনগুলোতে নামাজ, কোরবানি ও সামর্থ্যবানদের জন্য হজ পালনের যে সুযোগ আসে তা মুসলিম জীবনকে করে সমৃদ্ধ, পবিত্র ও পাপমুক্ত। আল্লাহপাকের বিধানকে মেনে আন্তরিকতা ও পবিত্রতার সাথে আমরা ঈদুল আজহার মহিমা উপলব্ধি করি এবং সেভাবে জীবনকে পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করি।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য

শতবর্ষের পথ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্যামল দত্ত

শিক্ষার অনির্বাণ আলো জ্বেলে, সত্য ও সুন্দরের আদর্শকে সমুন্নত রেখে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। অবশ্য এই যাত্রার পেছনে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গভঙ্গের জন্য পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমসমাজ বহুদিন ধরে তৎকালীন ব্রিটিশ-শাসকের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামের সাথে আসামকে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে ঢাকাকে এর রাজধানী ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনা অবিভক্ত ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। লর্ড কার্জনের কাছে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ ভারতের মুসলিম নেতাদের নিয়ে এ ধরনের একটি বিভক্তির দাবি করেছিলেন। তাই তাঁরা তাদের স্বার্থের অনুকূলে ভেবে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানান। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা কোনোভাবেই বঙ্গভঙ্গকে মেনে নেননি। তাঁরা সবসময় এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের চাপের মুখে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। মাত্র ছয় বছরের মাথায় ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়।

এদিকে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানসমাজ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১২ সালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তাঁরা ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে বাঙালি মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এরপর ২রা ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ৪ঠা এপ্রিল ব্রিটিশ-ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আহ্বান করলে স্যার রবার্ট নাথানিয়েলের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের 'নাথান কমিটি' গঠন করা হয়। প্রণীত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯২০'।

বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণসহ মহানগরীর সবুজ পরিবেশ রমনার ৬০০ একর জায়গাজুড়ে গড়ে ওঠে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর ১৯২১ সালের ১লা জুলাই কলা, বিজ্ঞান ও আইন এই তিনটি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এই বিভাগগুলো হচ্ছে– সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, ফারসি ও উর্দু, দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত ও আইন। শুরুতে মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭। এর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন মাত্র একজন। ছাত্রদের জন্য ছিল সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল এই তিনটি আবাসিক হল। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার স্যার পি জে হার্টগ (P J Hartog) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর অনেক আগে

থেকেই তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি এই দায়িত্ব পান। টানা পাঁচ বছর পি জে হার্টগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে প্রফেসর জি এইচ ল্যাংলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও দীর্ঘ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সাড়ে আট বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর ল্যাংলি। এরপর বহু কৃতী শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের মর্যাদাপূর্ণ পদটি অলংকৃত করেছেন। ১৯২১ থেকে শুরু করে ২০২১ পর্যন্ত সুদীর্ঘ শতবর্ষের যাত্রাপথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোট ২৮ জন ভাইস চ্যান্সেলর পেয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের তালিকা

১	স্যার পি জে হার্টগ	১.১২.১৯২০ থেকে ৩১.১২.১৯২৫
২	প্রফেসর জি এইচ ল্যাংলি	১.১.১৯২৬ থেকে ৩০.৬.১৯৩৪
৩	স্যার এ এফ রহমান	১.৭.১৯৩৪ থেকে ৩১.১২.১৯৩৬
৪	ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার	১.১.১৯৩৭ থেকে ৩০.৬.১৯৪২
৫	ড. মাহমুদ হাসান	১.৭.১৯৪২ থেকে ২১.১০.১৯৪৮
৬	ড. এস এম হোসেন	২২.১০.১৯৪৮ থেকে ৮.১১.১৯৫৩
৭	ড. ডব্লিউ এ জেনকিনস্	৯.১১.১৯৫৩ থেকে ৮.১১.১৯৫৬
৮	বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম	৯.১১.১৯৫৬ থেকে ২৭.১০.১৯৫৮
৯	বিচারপতি হামুদুর রহমান	৫.১১.১৯৫৮ থেকে ১৪.১২.১৯৬০
১০	ড. মাহমুদ হুসেইন	১৫.১২.১৯৬০ থেকে ১৯.২.১৯৬৩
১১	ড. মো. ওসমান গণি	২০.২.১৯৬৩ থেকে ১.১২.১৯৬৯
১২	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	২.১২.১৯৬৯ থেকে ২০.১.১৯৭২
১৩	ড. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী	২১.১.১৯৭২ থেকে ১২.৪.১৯৭৩
১৪	ড. আবদুল মতিন চৌধুরী	১৩.৪.১৯৭৩ থেকে ২২.৯.১৯৭৫
১৫	প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক	২৩.৯.১৯৭৫ থেকে ১.২.১৯৭৬
১৬	ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী	২.২.১৯৭৬ থেকে ২০.৩.১৯৮৩
১৭	ড. এ কে এম সিদ্দিক	২১.৩.১৯৮৩ থেকে ১৬.৮.১৯৮৩
১৮	ড. মো. শামসুল হক	১৭.৮.১৯৮৩ থেকে ১২.১.১৯৮৬
১৯	প্রফেসর আবদুল মান্নান	১২.১.১৯৮৬ থেকে ২২.৩.১৯৯০
২০	প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিয়া	২৪.৩.১৯৯০ থেকে ৩১.১০.১৯৯২
২১	প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ	১.১১.১৯৯২ থেকে ৩১.৮.১৯৯৬
২২	প্রফেসর শহিদ উদ্দিন আহমেদ	৩১.৮.১৯৯৬ থেকে ২৯.৯.১৯৯৬
২৩	প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী	৩০.৯.১৯৯৬ থেকে ১২.১১.২০০১
২৪	প্রফেসর আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী	১২.১১.২০০১ থেকে ৩১.৭.২০০২
২৫	প্রফেসর ড. এ এফ এম ইউসুফ হায়দার	১.৮.২০০২ থেকে ২৩.৯. ২০০২
২৬	প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ আবুল ফায়েজ	২৩.৯.২০০২ থেকে ১৬.১.২০০৯
২৭	প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক	১৭.০১.২০০৯ থেকে ৫.৯.২০১৭
২৮	প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান	৬.৯.২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত

১৯২১ থেকে ১৯৪৭। সূচনা পর্বের এই ২৬টি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত এই সময়ই 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে খ্যাতি অর্জন করে। এ সময়ের শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন সুপণ্ডিত ও জগদ্বিখ্যাত। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এ সময় তাঁর গবেষণার মাধ্যমে পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিকিরণ তত্ত্ব পড়াচ্ছিলেন। ১৯১৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী মাক্স প্লাঙ্ক-এর এই তত্ত্ব পড়াতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তত্ত্বটির কোথাও একটি ফাঁক আছে। কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। পরে তিনি নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেন। তাঁর এই উদ্ভাবনের বহু পরে 'গড পার্টিকেল' বা 'ঈশ্বর কণা'র সন্ধান মেলে। স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস্ এই তত্ত্ব প্রমাণ করেন। কেবল হিগস্ নন, পৃথিবীর আরও অনেক বিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে এই ভর 'উৎপাদন'-এর প্রক্রিয়াটি উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবিত এই তত্ত্বে প্রমাণ হয়েছে যে, সব মৌলিক কণারই ঘূর্ণন বলের একটি বিশেষ ধর্ম রয়েছে, যা পূর্ণ সংখ্যা (০, ১, ২...) বা অর্ধ পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে নির্দেশিত হয়। হিগস্‌ের সম্মানে 'ঈশ্বর কণা'কে 'হিগস্ কণা'ও বলা হয়। তবে হিগস্ পূর্ণ সংখ্যার দলটিকে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সম্মানে বলা হয় 'বোসন'। কারণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস ১৯২৪ সালে এ ধরনের কণার পরিসংখ্যান তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। ঢাকায় আবিষ্কৃত সেই তত্ত্বের ধারাবাহিকতায় আজ এই 'ঈশ্বর কণা' এখন বিশ্বব্যাপী 'হিগস্-বোসন কণা' নামেও বিশেষভাবে পরিচিত।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি। তৎকালীন বাংলার গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড লিটন (Lord Lytton) ছিলেন সমাবর্তন বক্তা। এরপর ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ। এরপর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আরও ১৫ বার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সমাবর্তন হয় ১৯৭০ সালের ৮ই মার্চ। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাবর্তন উদ্‌বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর আগেই ভোররাতে ঘটে যায় ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এরপর ১৯৯৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ থেকে আবারও নিয়মিতভাবেই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বশেষ ৫২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর।

১৯২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মুসলমান ছাত্রী ফজিলাতুননেসা ভর্তি হন। পরে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় সূচনা পর্বের আড়াই দশকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের আগমন ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্মানসূচক 'ডি. লিট' উপাধি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদেরকে বরণ করে নেয়। বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য অনেকবার এসেছেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত জীবনের প্রায় এক দশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী কার্জন হল

কাটিয়েছেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, বৃহত্তর পাবনার শাহজাদপুর এবং বৃহত্তর রাজশাহীর পতিসরে। তবে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কবির ঢাকা সফর বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ঢাকায় আসেন ১৮৯৮ সালে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দশম প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ঢাকার কার্জন থিয়েটারে এবং রবীন্দ্রনাথ এতে উদ্‌বোধনী সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। তখন কবির বয়স ৬৫ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসবেন এই খবরে রীতিমতো হুলুস্থুল শুরু হয়েছিল মহানগরী ঢাকাজুড়ে। কবিকে কোথায় সংবর্ধনা দেওয়া হবে, তিনি কার বাড়িতে থাকবেন– এসব বিষয় নিয়েও তুমুল হইচই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক জি এইচ ল্যাংলি কবিকে তাঁর নিজের বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে ইউরোপীয় খাবারে কবির অসুবিধা হতে পারে ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডক্টর রমেশ মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারি কবি যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল আয়োজিত সংবর্ধনাসভায়। হলের প্রভোস্ট স্যার এ এফ রহমান ছিলেন এই সংবর্ধনার অন্যতম উদ্যোক্তা। এই সংবর্ধনাসভা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ আবুল ফজল তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন– 'আমি আমার জীবনে ওরকম সংবর্ধনা দেখিনি– দেখিনি অতখানি আন্তরিকতা। সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল তখনকার মুসলিম হলের বিরাট ডাইনিং হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম সিঁড়ি থেকে হল পর্যন্ত পথের দু-ধারে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল নানা রকম ফুল আর হল ঘরের সবটাজুড়ে নানা ফুল, পাতা ও লতায় সাজিয়ে এখানে ওখানে রচিত হয়েছিল অসংখ্য কুঞ্জবন আর তাতে এমনভাবে বিভিন্ন পাখি রাখা হয়েছিল যাতে খাঁচাগুলো মোটেও নজরে না পড়ে.....আজ ভাবলে অবাক লাগে ঢাকার বুকে বসে অত ফুল কী করে জোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল'। এ দিন সন্ধ্যায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্যই কবিকে ঢাকায় আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ 'মিনিং অব আর্ট' বিষয়ের ওপর প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কবি 'দি রুল অব দি জায়েন্ট' শিরোনামে আরও একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানেরও আয়োজক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রাপ্তদের তালিকা

১৯২২	লরেন্স জন লামলে ডানডাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর	ডক্টর অব ল'জ
১৯২৫	ফিলিপ জোসেফ হার্টগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর	ডক্টর অব ল'জ
১৯২৭	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ আর্ল অব লিটন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর	ডক্টর অব লিটারেচার ডক্টর অব ল'জ
১৯৩২	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, পদার্থবিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর	ডক্টর অব সায়েন্স ডক্টর অব ল'জ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রাপ্তদের তালিকা		
১৯৩৬	স্যার আবদুর রহিম, রাজনীতিবিদ	ডক্টর অব ল'জ
	স্যার জন এন্ডারসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর	ডক্টর অব ল'জ
	স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ ও জীববিজ্ঞানী	ডক্টর অব সায়েন্স
	স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রসায়নবিদ	ডক্টর অব সায়েন্স
	স্যার যদুনাথ সরকার, ইতিহাসবিদ	ডক্টর অব লিটারেচার
	স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, কবি ও দার্শনিক	ডক্টর অব লিটারেচার
	স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি ও সাহিত্যিক	ডক্টর অব লিটারেচার
	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৩৭	স্যার এ এফ রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর	ডক্টর অব ল'জ
১৯৪৯	খাজা নাজিমুদ্দিন, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	ডক্টর অব ল'জ
১৯৫১	স্যার মোহাম্মদ শাহ আগা খান, আগা সুলতান	ডক্টর অব ল'জ
১৯৫২	ড. আবদুল ওয়াহাব আজম, কূটনীতিক	ডক্টর অব ল'জ
১৯৫৬	আবুল কাশেম ফজলুল হক, রাজনীতিবিদ	ডক্টর অব ল'জ
	ইস্কান্দার মির্জা, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	ডক্টর অব ল'জ
	চু-এন লাই, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী	ডক্টর অব ল'জ
	মাদাম সুং চিং লিং	ডক্টর অব ল'জ
১৯৬০	জামাল আবদেল নাসের, যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি	ডক্টর অব ল'জ
	আইয়ুব খান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি	ডক্টর অব ল'জ
১৯৭৪	সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পদার্থবিজ্ঞানী	ডক্টর অব সায়েন্স(মরণোত্তর)
	মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা, রসায়নবিদ	ডক্টর অব সায়েন্স
	কাজী মোতাহার হোসেন, পরিসংখ্যানবিদ	ডক্টর অব সায়েন্স
	হীরেন্দ্রলাল দে, বিজ্ঞানী	ডক্টর অব সায়েন্স
	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বহুভাষাবিদ	ডক্টর অব লিটারেচার
	কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের জাতীয় কবি	ডক্টর অব লিটারেচার (মরণোত্তর)
	আবুল ফজল, সাহিত্যিক	ডক্টর অব লিটারেচার
	ওস্তাদ আলী আকবর খান, সংগীতজ্ঞ	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৯৩	আবদুস সালাম, পদার্থবিজ্ঞানী	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৯৭	ফেদারিকো মায়ার, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৯৯	অমর্ত্য সেন, অর্থনীতিবিদ	ডক্টর অব সায়েন্স
	শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী	ডক্টর অব ল'জ
২০০৪	মাহাথির বিন মোহাম্মদ, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী	ডক্টর অব ল'জ
২০০৭	মুহাম্মদ ইউনূস, অর্থনীতিবিদ	ডক্টর অব ল'জ
২০০৯	ইউয়ান তেইস লি, রসায়নবিদ	ডক্টর অব সায়েন্স
	আবুল হাসেম, রসায়নবিদ	ডক্টর অব সায়েন্স
	রণজিত গুহ, ইতিহাসবিদ	ডক্টর অব লিটারেচার
২০১০	আবদুল্লাহ গুল, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি	ডক্টর অব ল'জ
২০১১	বান কি মুন, জাতিসংঘের মহাসচিব	ডক্টর অব ল'জ
২০১২	ইরিনা বোকোভা, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক	ডক্টর অব ল'জ
২০১৩	প্রণব মুখোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রপতি	ডক্টর অব ল'জ
২০১৪	প্রফেসর অধ্যাপক রোলফ হুয়ের, মহাপরিচালক, পারমাণবিক গবেষণা বিষয়ক ইউরোপীয় সংস্থা	ডক্টর অব সায়েন্স
২০১৫	ফ্রান্সিস গ্যারি, বিশ্ব মেধাসত্ত্ব সংস্থার মহাপরিচালক	ডক্টর অব ল'জ
২০১৭	প্রফেসর অমিত চাকমা, ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিও, কানাডা	ডক্টর অব সায়েন্স
২০১৯	ড. তাকাকি কাজিতা, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ও পরিচালক, কসমিক রে রিসার্চ ইনস্টিটিউট, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান	ডক্টর অব সায়েন্স

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর এ দেশের কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগের কলেজগুলোর দায়িত্ব অর্পিত হয় ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে 'উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই প্রথম প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। অবশ্য ১৯৪৮-এ দেশ বিভাগের পর পরই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষকরা মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি আসে ভাষা আন্দোলন। আর সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সেদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্বৈরশাসকের ১৪৪ ধারা অমান্য করে এখান থেকেই শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক গণমিছিল।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ধারা কখনও ব্যাহত হয়নি। ১৯৬১-র পর বেশ কটি নতুন অনুষদ ও কিছু বিভাগ চালু করা হয়। নির্মিত হয় কিছু নতুন আবাসিক হল। এ সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নামে নির্মিত হয় আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস 'পি জে হার্টগ হল'। ১৯৬৩ সালে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত নেত্রী বেগম রোকেয়ার নামানুসারে ছাত্রীদের জন্য প্রথম আবাসিক হল নির্মিত হয়। নির্মিত হয় কলা ভবন। সৃষ্টি হয় কিছু নতুন ইনস্টিটিউট। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র 'টিএসসি'-র মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মিলন কেন্দ্রটিও গড়ে ওঠে এই সময়। এদিকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর অবিভক্ত ভারতবর্ষের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেখানে বেশিদিন পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন থেকে তাঁকে সরে আসার নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন থেকে সরে যাননি। কর্মচারীদের এই আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় মুজিব ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' ঘোষণার অপরাধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা তাঁকে কারামুক্ত করে আনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'ডাকসু'-র নেতা তোফায়েল আহমেদ ১৯৬৯-এ কারামুক্ত মুজিবকে এক বিশাল গণ-সংবর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে অভিষিক্ত করেন।

ষাটের দশকে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সামরিক শাসনবিরোধী গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই সোচ্চার ছিল। ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছেন। ১৯৭১-এ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই স্বাধীনতার প্রথম পতাকা ওড়ানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ডামি রাইফেল নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের বর্বর সেনারা এ দেশের যেসব স্থাপনাকে তাদের টার্গেট হিসেবে বেছে নেয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এক রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক ও ২৬ জন কর্মচারীসহ প্রায় তিনশ জন প্রাণ হারান। নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক

হলে। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর এ দেশীয় সহচর ঘৃণ্য রাজাকার, আলবদরদের চক্রান্তে নির্মমভাবে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক জি সি দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, এ এন এম মুনিরুজ্জামান, ফজলুর রহমান খান, মুক্তাদির মুহাম্মদ সাদেক, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রাশিদুল হাসান, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, আবুল খায়ের, সিরাজুল হক খান, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও ফয়জুল মাহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব কৃতী শিক্ষকদের স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু আবাসিক হলের নামকরণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতে বাবা আদিত্যচন্দ্রের হাত ধরে কিশোর মধুসূদন দে এসেছিল ঢাকায়। কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ক্যাম্পাসে তাঁরা খাবার বিক্রি করতেন। পরে 'মধুর ক্যান্টিন' নামে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে মধুসূদন নির্মমভাবে নিহত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁর স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৬১-র 'কালা কানুন' বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেওয়া হয় সর্বোচ্চ সম্মান। তিন বছরের অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বার্ষিক কোর্স পদ্ধতি এবং পরে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সনাতন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির পরিবর্তে চালু হয় গ্রেডিং পদ্ধতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্বপ্নের 'চারুকলা ইনস্টিটিউট' এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষদ। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্পকলার বিভিন্ন বিভাগও এখানে চালু করা হয়। চালু করা হয় নাট্যকলা ও সংগীত এবং টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের মতো কিছু সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

মুক্তিযুদ্ধের অমর স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরে নির্মাণ করা হয়েছে 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্য। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল আঙিনায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য রয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে রয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ 'কেন্দ্রীয় শহিদমিনার'। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সড়কদ্বীপে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে স্বোপার্জিত স্বাধীনতা। ফুলার রোডে সলিমুল্লাহ্ হল, জগন্নাথ হল ও বুয়েটসংলগ্ন সড়ক দ্বীপে রয়েছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ভাস্কর্য 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'। ফুলার রোডের সড়কদ্বীপে উপাচার্য ভবনের পাশে রয়েছে 'স্মৃতি চিরন্তন'। কার্জন হলের সামনে 'দোয়েল চত্বর', বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েলের একটি স্মারক ভাস্কর্য। দোয়েল চত্বরের উত্তর পাশে রয়েছে তিন নেতার মাজার ঢাকার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন। এটি স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলার তিন রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সমাধি। তিন নেতার মাজারের পাশেই 'ঢাকা গেইট', বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি ঐতিহাসিক মোগল স্থাপনা। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে সন্ত্রাসবিরোধী 'রাজু স্মারক ভাস্কর্য' বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান ভাস্কর্য। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে রয়েছে 'শান্তির পায়রা' ভাস্কর্য। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দ ভাস্কর্য', 'ঘৃণাস্তম্ভ', 'মধুদা-র ভাস্কর্য', 'সপ্তশহীদ স্মৃতিস্তম্ভ', 'বৌদ্ধ ভাস্কর্য' ও 'শহীদ ডাক্তার মিলন ভাস্কর্য'। দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য দর্শককে যেমন মুগ্ধ করে তেমনি কখনও আবেগাপ্লুতও করে তোলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদমিনার প্রাঙ্গণেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তাঁদের সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে অনুপম অবকাঠামো। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, কমকর্তা, কর্মচারীও চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন এই সমাধি প্রাঙ্গণে।

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সর্বোচ্চ এবং গৌরবময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সময়ের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছে। একাডেমিক কার্যক্রমে এখন কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, আইন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষদে একাধিক বিভাগ, ইনস্টিটিউট, রিসার্চ সেন্টার ও ব্যুরো নিয়ে এগিয়ে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টিতে ঢাকার নওয়াবদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ নির্মাণ করা হয়েছে 'নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন'। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি অনুষদ, ৮৩টি বিভাগ, ১২টি ইনস্টিটিউট, ২০টি আবাসিক হল, তিনটি হোস্টেল এবং ৫৬টির বেশি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সংখ্যা এখন যথাক্রমে ৩৭,০১৮ জন এবং ১,৯৯২ জন। একটি আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থাগার রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জার্নাল, সাময়িকীতে সুসজ্জিত এই গ্রন্থাগার। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ইতোমধ্যেই আধুনিক সরঞ্জামসহ উচ্চতর গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে রাখা হয়েছে আলাদা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা। ক্রীড়া ও খেলাধুলার জন্য আছে খেলার মাঠ এবং উন্নত মানের জিমনেসিয়াম। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অতুলনীয়। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে বাংলা বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাই বলে দেয়, এ আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ফেব্রুয়ারিতে অমর একুশের বর্ণিল আয়োজনের নেতৃত্বেও থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বব্যাপী অতিমারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সত্ত্বেও ২০২১ সালটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরই জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ইতিহাসের এমনই একটি মাহেন্দ্রক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল পথ অতিক্রম করছে। এই আলোকিত পথচলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আরও সুদূরপ্রসারী এবং গৌরবান্বিত করবে।

তথ্যসূত্র

(১) *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*– সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইউপিএল, ঢাকা

(২) *ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ*– গোপালচন্দ্র রায়

(৩) *বাংলাদেশে বরীন্দ্র সংবর্ধনা*– ভূঁইয়া ইকবাল

(৪) *Beyond the god particle*– Lederman, Leon M, Hill, Christopher T, New York

(৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট

লেখক: স্ক্রিপ্ট রাইটার ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

হুমায়ূন আহমেদ শিল্পী ও চলচ্চিত্রের নিখুঁত কারিগর

ইমরুল কায়েস

পৃথিবীর একটি মাত্র দেশ বাংলাদেশ যার পতাকার সবুজ জমিনের মাঝে লাল সূর্য আছে। ঠিক তেমনি এদেশের সাহিত্যের সবুজ জমিনে অদ্বিতীয় উজ্জ্বল ও লেখনীর জোরে জ্বলজ্বল করেন নিয়ত তিনি হুমায়ূন আহমেদ। তিনি ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শহিদ বুদ্ধিজীবী ফয়জুর রহমান আর মা গৃহিণী ও লেখিকা আয়েশা ফয়েজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় তাঁর প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর আর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দীর্ঘ পাঁচ দশক থেকে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু লেখালেখি নিয়ে এই কলম কারিগরের কাজ ছিল না। তিনি বহুরূপী সত্তায় ছিলেন কথাকার, গল্পকার, নাট্যকার, নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক এবং নির্মাতা। তাঁর চলচ্চিত্রে তিনি নিজেই গীতি রচনা করতেন। এদিক থেকে তিনি একজন সফল গীতি রচয়িতা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মাণ করেছেন দৃষ্টিনন্দন সব চলচ্চিত্র– *শ্যামল ছায়া*, *শ্রাবণ মেঘের দিন* এবং *জোছনা ও জননীর গল্প*। সাহিত্যে এনেছেন নতুন করে গল্প বলার সাবলীল ঢং। নাটকে দিয়েছেন মধ্যবিত্তের ব্যঞ্জনা আর চলচ্চিত্রে লোকজ উপাদানের সঙ্গে দেশপ্রেম। বাংলাদেশের আনাচেকানাচে সব রকমের পাঠক ও দর্শকের কাছে এতটা পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র হুমায়ূন আহমেদের কপালে জুটেছে।

গল্প, নাটক আর চলচ্চিত্রের জাদুকর হুমায়ূন আহমেদকে স্মরণ না করলে একটা কিছু অপূর্ণই থেকে যায়! কয়েকটি সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রের লোকজ সংস্কৃতির ব্যাখ্যার একটি প্রশ্নের উত্তরের সূচনা লিখেছিলাম নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত শেষ চলচ্চিত্র *ঘেটুপুত্র কমলা* দিয়ে। এরচেয়ে ভালো লোকজ উপাদান নিয়ে তৈরি আর কোনো সিনেমা আমার জানামতে একটিও তৈরি হয়নি। নদী, নারী, জল, আর যৌবন যে কতটা নিবিড় উপাদান লোকজ সংস্কৃতির! বিশেষ করে লোকগীতিতে নদী আর নারীর রূপকল্প নিয়ে বয়ান, উপমা, উদাহরণের শেষ নেই।

খ্যাতিমান অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ *নন্দিত নরকের* ভূমিকায় যেমনটি বলেছিলেন–'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের ভালো ছাত্র। কিন্তু ও যে (হুমায়ূন আহমেদ) এত ভালো গল্প লিখিয়ে তা বোঝা গেল এ রচনা পাঠের পর।'

পাকিস্তানের বিখ্যাত *ডন পত্রিকা* যাঁকে বলেছে–'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কিংবদন্তি' তিনি আর কেউ নন, আমাদেরই হুমায়ূন আহমেদ। তিনি স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংস্কৃতির বা লোকরঞ্জক সাহিত্যের জগতে একজন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। স্বাধীনতার পূর্বে ও দেশভাগের আগে এবং পরে বাংলা কথাসাহিত্যে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের। একমাত্র হুমায়ূন আহমেদ এই ধারাটিকে ভেঙে এপার বাংলার সাহিত্যের একটি আলাদা জগৎ ও পাঠক তৈরি করে গেছেন। তাইতো ওপার বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আহমেদ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে জনপ্রিয়'।

পশ্চিম ও পূর্ব বাংলায় সাহিত্যিক মানিক বাবু, সুনীল ও সমরেশ মজুমদারের বইয়ের ছিল ছড়াছড়ি। সাহিত্যের কোনো ভৌগোলিক সীমানা বা মালিকানা না থাকলেও কেন জানি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদেরও একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিকের খুবই দরকার ছিল। ঠিক যুদ্ধোত্তর বিরহী, ক্ষুধিত ও এতিম পাঠকের জন্য একজন কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় প্রথম *নন্দিত নরকে* নামক নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তিনিই হুমায়ূন আহমেদ।

ছাত্র অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকতে এমন একটি অনিন্দ্য কথাসাহিত্য *নন্দিত নরকে* রচনা করেছেন। তাঁর এই প্রথম উপন্যাসটির প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন আর একজন প্রবাদপুরুষ আহমদ ছফা, বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তাঁরই আপন অনুজ জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যিক জাফর ইকবাল আর বইটির ভূমিকা লিখেছেন আহমদ শরীফ। জীবনে আর কী লাগে? প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসে বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনের তিনজন আজন্ম গুণীর ছোঁয়া কয়জনই বা পায়! তারপর থেকে বাংলাদেশের সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রে একজন হুমায়ূন আহমেদই হতে পেরেছেন। নিশ্চিত অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে নাটক আর চলচ্চিত্র নির্মাণে থিতু হয়েছেন। তাঁর চলচ্চিত্র মানে সাধারণ চোখের দেখা বিষয় রঙিন পর্দায় দ্বিগুণ বেগে অসাধারণ দৃশ্যপট! যেন একজন দর্শকই প্রতিটি চরিত্রকে নিজের বলে ভাবেন।

নরক একটি বীভৎস শব্দ! তার আগে একটি সুন্দর শব্দ নন্দিত যে বসতে পারে খুব সহজে এটিকে বসানোর শৈলী যাঁর আয়ত্তে ছিল সেই কথার জাদুকর আমাদের ছেড়ে প্রয়াত হয়েছেন ১৯শে জুলাই ২০১২ সালে। শারীরিকভাবে বেঁচে না থাকলেও আছেন শাশ্বত কথামালায় প্রতিদিনের শতদল হয়ে অসংখ্য পাঠকের হৃদ সিংহাসনে।

বৃষ্টি বিলাস, জোছনা বিলাস এমনকি সমুদ্র বিলাসের জন্য সেন্টমার্টিনে তাঁর নিজস্ব রিসোর্ট–সমুদ্র বিলাস এবং আরো আছে জোছনা বিলাস। 'চাঁদনি পসরে কে আমায় স্মরণ করে; কে আইসা দাঁড়াইছে গো আমার দুয়ারে?' এমন গানের কথা আর দ্বিতীয়টা কোনো চলচ্চিত্রে নেই। তাঁর দক্ষিণা হাওয়ার বাড়িতে এখনো কি জোছনার আলোয় বৃষ্টি বিলাস চলে? চলে তো অবশ্যই। শুধু আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই না এই আর কী। এ কথার উত্তর তাঁর গানেই আছে– 'আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা চালা ভাঙা বেড়ার ফাঁকে/ অবাক জোছনা ঢুইকা পরে; হাত বাড়াইয়া ডাকে'।

'বিলাস' শব্দটা হুমায়ূন আহমেদের খুব আপন ও একান্ত আপনার। কেননা তাঁর ভাষার বিলাসে যে এত চমৎকার সব সাহিত্যকর্ম

রচনা হয়েছে। স্বপ্ন, কল্পনা আর শব্দ নিয়ে বিলাসী না হলে আদৌ কেউ সাহিত্যের চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না– এ শতভাগ নিশ্চিত। এ দিকটায় হুমায়ূন আহমেদ ষোলো কলায় পরিপূর্ণ। কেননা সৃজনশীল, মননশীল আর পারফরম্যান্স আর্ট-এ তিনি পরিযায়ী না হয়ে পরিশীলিত আধার হয়ে আছেন। চলচ্চিত্র, নাটক আর গল্প-উপন্যাসে জনতুষ্টি বা সর্বজনীন উদাহরণ তাঁর সৃষ্ট কর্মসমূহ।

নরককেও নন্দিত করার এই কারিগর গান রচনা করেও তুমুল জনপ্রিয়। তাঁর পরিচালিত *শ্রাবণ মেঘের দিন* চলচ্চিত্রটি সাতটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। এই চলচ্চিত্রের সর্বাধিক শ্রোতাপ্রিয় গান–'একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘ বরণ কেশ/ ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ'। লোকজ সংস্কৃতির আশ্রয় নিয়ে এমন গান রচনা বিস্তৃত বাংলার মাটির সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে।

কথাসাহিত্যে জনপ্রিয় উপন্যাস– *শঙ্খনীল কারাগার*, *দেবী*, *আগুনের পরশমনি*, *শ্যামল ছায়া*, *নয় নম্বর বিপদ সংকেত* ও *দুই দুয়ারি* চলচ্চিত্রায়ণও ব্যাপক দর্শকপ্রিয় হয় এবং পুরস্কার পেয়েছে। শব্দের খেলায় নন্দিত হয়ে নাটকে দেখিয়েছেন আরেক নৈপুণ্য। হুমায়ূন আহমেদের নাটক মানে শুধু নাটক নয়, যেন মধ্যবিত্ত জীবনের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। *অয়োময়*, *আজ রবিবার*, *এই সব দিনরাত্রি*, *বহুব্রীহি* ও *জননী* এখনো সমান তালে যুগপ্রিয়। নাট্যকার, নির্দেশক, পরিচালক ও গীতি রচনাকারীর জন্য তিনি অনুকরণীয়। *দারুচিনি দ্বীপ*, *চন্দ্রকথা*, *আমার আছে জল*, *কৃষ্ণপক্ষ* এবং সর্বশেষ *ঘেটুপুত্র কমলা* এক একটি মাস্টার পিস– কী নির্মাণে, কী গীতি রচনায়, কী অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে–তিনি সবার থেকেই এগিয়ে। কথাসাহিত্য থেকে নাট্যকার আবার বৃহৎ পরিসরে পর্দায় সেই চরিত্রগুলোকে নিখুঁতভাবে গতি দিয়ে তিনি শেষ চলচ্চিত্রেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন– শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার বিভাগে দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছেন এবং ১৫তম মেরিল-প্রথম আলো সেরা চলচ্চিত্র পরিচালকের পুরস্কার পান।

কথার কথক থেকে নাটকে তারপর সিনেমায় তিনিই সব–তাঁর গল্প, তাঁর গান, তাঁর চিত্রনাট্য, তাঁর প্রযোজনা ও তাঁরই পরিচালনায় তুমুল দর্শকপ্রিয় এই সব আর্টে মনে হয় এক হুমায়ূনের বহুরূপ! যেমনটি নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা। নান্দনিক এই শব্দ শৈলীর কারিগরকে আমরা আজো পাই তাঁর 'জননী' নাটকে। বছরে, মাসে কিংবা দিনে মোবাইলে ইউটিউবে এখনো শুনি– 'যদি মন কাঁদে/... তুমি চলে এসো এক বরষায়...' এই বরষা বিলাসী মানুষটি চলেও গেছেন বর্ষাকালে। বর্ষায় যার ইহলোক থেকে পরলোকে প্রস্থান তাঁর মন কেন কাঁদবে? বাকের ভাইয়ের ফাঁসি রোধ করার মতো আন্দোলনে আবারো শরিক হবে তাঁরই অজস্র হিমু।

বাংলা নাটকের একটি ভিন্ন অধ্যায়ের নাম হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর নাটকে চিত্রিত হয়েছে মধ্যবিত্ত আটপৌঢ়ে জীবনের চলন্ত প্রতিচ্ছবি– হাসি, কান্না আর ভালোবাসা-ভালোলাগার প্রিয় সব আনাগোনা। শুধু বাংলাদেশে নয়, ওপার বাংলার মানুষের কাছে বিটিভি'র নাটকের আলাদা একটি কদর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি। কেন জানি তাঁর নাটক মানেই একটা ভিন্ন আমেজের আলাদা কিছু। নাট্যপরিচালক ও নির্দেশক হিসেবে হুমায়ূনের বিকল্প তিনি নিজেই। তাঁর হাত ধরে অভিনয়ে এসে এখনো সমুজ্জ্বল– ডা. এজাজ, প্রাণ রায়, চ্যালেঞ্জার, মণিরা মিঠু, মাহফুজ আহমেদ, মেহের আফরোজ শাওন ও বিদ্যা সিনহা মিম প্রমুখ। বলা যায়, তিনি একজন ক্যামেরা লেন্স অধিকারী মানুষ। কেননা যে মানুষগুলোকে অভিনয়ে নিয়ে এসেছিলেন সবাই এখন গুণী অভিনয় শিল্পী। তিনি ছিলেন শিল্প ও শিল্পী গড়ার নিখুঁত কারিগর।

রাষ্ট্রীয় ও বিভিন্নভাবে পেয়েছেন সম্মান ও পুরস্কার। একুশে পদক পেয়েছেন ১৯৯৪ সালে, ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি, লেখক শিবির পুরস্কার ১৯৭৩, মাইকেল মধুসূদন পদক ১৯৮৭ এবং হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার ১৯৯০ ও জয়নুল আবেদীন স্বর্ণ পদক ১৯৯০ সহ চলচ্চিত্রে পেয়েছেন জাতীয় অনেক পুরস্কার।

ছোটো, সহজ ও খণ্ড খণ্ড বাক্যে ছোটো তিন-চার ফর্মার উপন্যাস লিখে পেছনের সব ভারী ভারী রচনাকে টপকে বিশের দশকে একক স্থান করে নেওয়া এই কথার মালি যেন সত্যি তাঁর গীতের মতো জীবনে এক আচানক কলম খুঁজে পেয়েছিল– 'সোহাগপুর গ্রামে একটা মায়া দিঘি ছিল/ সেই দিঘিতে হায়; আচানক একটা পুষ্প ফুটে ছিল'। প্রকৃতির রূপ বিলাসী এই কথা-কথক সত্যিই একজন কলম কারিগর ও ক্যামেরার নিউরন তাঁর সবার থেকে আলাদা ছিল। এক হুমায়ূন বহু হলুদ হিমু হয়ে আমাদের মাঝে থাকবে চির অমলিন। হুমায়ূনের গানেই আমাদের শেষ চাওয়া– 'ও কারিগর। দয়ার সাগর/ ও গো দয়াময়/ চাঁদনি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়'।

লেখক : গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, এনবিআর

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

উত্তর অঞ্চলের সমতল ভূমিতে চা চাষ

মো. জাহাঙ্গীর আলম

চা বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত নগরায়ণের ফলেও জনগণের শহরমুখিতার কারণে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলেও চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে। বিগত প্রায় চার দশক ধরে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। অনেক আগে থেকেই দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জিডিপি'তে চায়ের অবদান প্রায় দশমিক ৮১ শতাংশ। দেশে চায়ের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে। লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, চা উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে নবম। অনেক আগে থেকেই চা এদেশে একটি কৃষিভিত্তিক শ্রমঘন শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আমদানি বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে চা চাষ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের উত্তর অঞ্চলে অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকরা প্রচলিত কৃষি পণ্য চাষাবাদের পাশাপাশি অর্গানিক চা চাষে বেশি ঝুঁকছে। উত্তর অঞ্চলে বাগানভিত্তিক চা চাষ ছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা নিজেরাই তাদের জমিতে চা বাগান করেছে। কৃষিপণ্যের চেয়ে চা চাষে বেশি লাভ হওয়ায় চা চাষ করে উত্তর অঞ্চলের পাঁচ জেলা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাটের মানুষ এখন সচ্ছল।

সিলেট ও চট্টগ্রামের প্রচলিত বৃহত্তাকার টি এস্টেট বা চা বাগান এর বাইরে এসে দেশের উত্তরের জনপদের পাঁচ জেলায় ক্ষুদ্রায়তন ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা নিজেরাই তাদের জমিতে অর্গানিক চা বাগান করেছে। উত্তর অঞ্চলের সমতল ভূমিতে চা চাষের সফলতায় এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। একদিকে দরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হয়েছে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ অঞ্চলের চা চাষ সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে নতুন নতুন চা বাগান। চা পানে যেমন মানুষ সজীব-সতেজ হয় তেমনি এ জনপদের মানুষ চা চাষ করে আর্থসামাজিক অবস্থার সজীব-সতেজ অবস্থা ফিরে এসেছে।

সমতলের চা চাষ বদলে দিয়েছে হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিক ও বেকার তরুণ-তরুণীদের ভাগ্য। চা বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, উত্তরাঞ্চলে চা বাগান, প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও প্যাকেটজাতকরণে ছোটো কারখানাগুলোতে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রায় অর্ধেকই নারী। চা বাগান ও কারখানাগুলোতে কাজ করে এখন অনেকেরই জীবনমানের পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া চা শিল্প থেকে প্রতিবছর সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে পঞ্চগড়ের তৎকালীন জেলা প্রশাসক-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখানে পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালের দিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়। সীমান্তঘেঁষা ভারতে গড়ে তোলা চা বাগান এবং দেশের পরীক্ষামূলক চা চাষে অনুপ্রাণিত হয় চাষিরা। বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় এগিয়ে আসে স্থানীয় ক্ষুদ্র চা চাষিরা। বাংলাদেশ চা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে উত্তরের এ অঞ্চলে পাঁচ জেলায় নিবন্ধিত ১ হাজার ৫১০টি এবং অনিবন্ধিত ৫ হাজার ৮০০টি ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে কর্মরত (২৫ একর পর্যন্ত) রয়েছে।

৫টি জেলায় বর্তমানে নিবন্ধিত ১০টি ও অনিবন্ধিত ১৭টি বড়ো চা বাগান (২৫ একরের ওপরে) রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ হাজার ১৭০ একর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অপরদিকে, দেশে মোট ১৬৭টি চা বাগান যা বাংলাদেশ চা বোর্ড থেকে নিবন্ধনকৃত। এর মধ্যে ১২৯টি স্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত টি এস্টেট, ৩১টি স্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত চা বাগান এবং ৭টি অস্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত চা বাগান। ২০২০ সালে দেশের ১৬৭টি চা বাগান এবং ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান থেকে মোট ৮ কোটি ৬৩ লাখ ৯ হাজার কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। উত্তর অঞ্চলের পাঁচ জেলার চা বাগানসমূহ থেকে ২০২০ সালে প্রায় ৫ কোটি ১৩ লাখ কেজি সবুজ চা পাতা উত্তোলন করা হয়েছে। যা থেকে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও-এর ১৮টি চলমান চা কারখানায় প্রায় ১ কোটি ৩ লাখ কেজি চা উৎপন্ন হয়েছে। যা প্রায় মোট চা উৎপাদনের ১০ শতাংশ। বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে ১ হাজার ৪৯০ একর চা আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে ও ৭.১১ লাখ কেজি চা বেশি উৎপন্ন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলের ১২ বছরের (২০০৯-২০২০ সাল) উত্তরের পাঁচ জেলায় চা আবাদির পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০ হাজার ১৭০ একর (৪১১৭ হেক্টরে) উন্নীত হয়েছে এবং চায়ের উৎপাদন প্রায় ষোলো গুণবৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৩ লাখ কেজি তৈরি চায়ে উন্নীত হয়েছে। যা এযাবৎকালে উত্তরের জনপদের চা শিল্পের সর্বোচ্চ রেকর্ড। পঞ্চগড় জেলায় যেসব জমিতে এখন চা আবাদ হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশই পূর্বে অনাবাদি এবং চারণভূমি ছিল। পঞ্চগড়ে চা চাষের ফলে অত্র এলাকার সরাসরি প্রায় ২০ হাজার জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়)

উত্তরের পাঁচ জেলার পর এবার বৃহত্তম ময়মনসিংহের শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলার কিছু অংশে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়েছে। গারো হিলস টি কোম্পানি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গারো পাহাড় অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে চা বাগানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ অঞ্চলের আগ্রহী চাষিদের মাঝে চা চাষের প্রশিক্ষণ ও চারা বিতরণের মাধ্যমে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে চা আবাদ বৃদ্ধি করে চায়ের উৎপাদন বাড়িয়ে নিজস্ব চাহিদা মিটানো এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকার ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আর্থসামাজিক উন্নয়নে পাঁচ বছর মেয়াদি তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে– এক. এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস; দুই. এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ এবং তিন. ইরাডিকেশন অব রুর‍্যাল পভারটি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট। দেশের চা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে পঞ্চগড়সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ নামে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ড। এই প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুনের মধ্যে পাঁচ জেলা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাটে এক হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে চা চাষ করা হয়। অপরদিকে, উত্তরের একটি জেলায় ইরাডিকেশন অব রুর‍্যাল পভারটি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুনের মধ্যে লালমনিরহাটে ১০০ হেক্টর জমিতে চা চাষাবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা হয়েছে। এছাড়াও এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে পার্বত্য এলাকায় ৩০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে চা চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জাতীয় চা নীতিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–উত্তর অঞ্চলের পাঁচ জেলায় সমতল ভূমিতে, পার্বত্য জেলাসমূহ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ শুরু হয়েছে। জাতীয় চা নীতি অনুযায়ী এ সকল এলাকার চা চাষিদের চা চাষের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ, ভরতুকি এবং চা চারা প্রদান করা হচ্ছে। এ নীতিতে আরো বলা হয়েছে– ক্ষুদ্র চা চাষিদের আয়বর্ধনের জন্য সাথী ফসলের চাষ করতে হবে। স্বল্পকালীন ও ভূমির জৈব উপাদান সমৃদ্ধ করে এইরূপ ফসল সাথী হিসেবে চাষ করতে হবে। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা করবে এবং লব্ধজ্ঞান ক্ষুদ্র চা চাষিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। এছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন নিবিড় চা চাষের জন্য ও চা এলাকা সম্প্রসারণের জন্য বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রেসক্রাইভড ক্লোনস, বাই-ক্লোনাল ও পলি-ক্লোনাল চা বীজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দেশের সমতল ভূমিতে চা চাষের জন্য উত্তরের জেলাগুলো অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এলাকা। সরকার চায়ের চাষ সম্প্রসারণের জন্য চাষিদের বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করছে। কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমতল ভূমিতে চা চাষ করছে। সমতল ভূমিতে চা চাষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। চায়ের উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে সমতল ভূমির এই চা চাষ।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি, ঢাকা

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জের উদ্‌বোধন

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জ'-এর উদ্‌বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে লাউঞ্জটি স্থাপন করা হয়। ১৪ই জুন এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'লাউঞ্জটিতে বিভিন্ন বই, ছবি, প্রামাণ্যচিত্র ও গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। বহুপাক্ষিকতাবাদ, বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতি জাতির পিতার যে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জের এই সংগ্রহ যেন তা-ই ফুটিয়ে তুলেছে'। তিনি লাউঞ্জটিতে জাতির পিতার উপর আরও বই ও প্রদর্শনী সামগ্রী প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা এ সময় জানান, 'গত বছর লাউঞ্জটি স্থাপনের কাজ শেষ হলেও করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস, লাউঞ্জটি মিশনে আগত সুধীজনদের বিশ্ব শান্তির প্রতি জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে'।

প্রতিবেদন : সুরাইয়া শিমুল

ইয়াস মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা

ইমরুল ইউসুফ

দেখতে দেখতে গ্রামগুলো তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল ঘরবাড়ি, বাজার-ঘাট, দোকান-পাট। একটু আগে যেখানে ছিল খটখটে মাটি, আঁকাবাঁকা পথ, সবুজ মাঠ, ডোবা-নালা-পুকুর। এখন সেখানে পানির প্রবাহ। টলটলে পানি। পথগুলো পথহারা। মানুষগুলো ঘরছাড়া। পশুপাখিও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দিকহারা। রুপালি পানিতে ডুবেছে সব। পানির তোড়ে ভেসেছে মাছ। নদীর লবণগোলা পানি খেয়ে মরেছে মিষ্টি পানির মাছ। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের তাণ্ডবে ফুসে উঠল সাগর, নদীর পানি। সঙ্গে পূর্ণিমার প্রভাব। ফলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জোয়ারের মুখে পড়ল। পানির প্রবল স্রোতে বাঁধ ভাঙল। জনজীবনে উঠল হাহাকার।

পূর্ণিমার চাঁদ মুখ লুকিয়েছে মেঘের ভাজে। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস তার দিক পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ছেড়েছে। কমেছে জোয়ারের পানি বুক ফুলিয়ে প্রবাহের ভঙ্গি। তবে হাহাকার কাটেনি। অভাব-অনটন কাটেনি। লোনা পানির ঘোরাটোপে পড়ে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ এখন অসহায়। চারদিকে এত্তো এত্তো পানি, অথচ খাবার পানি নেই। মাছ তো সেই কবে মরে ভেসে গেছে। গাছের গোড়ায় লোনা পানি জমে অনেক ফলজ, বনজ গাছ মারা গেছে। মরেছে পশুপাখি। বৃষ্টির পানিই এখন ভরসা। এই পানিতে রান্নাবান্না, খাওয়া, গোসল– আরও কত কী।

মে মাসের ২৪ তারিখ থেকে পুরো সপ্তাহ খুবই আতঙ্কে কেটেছে উপকূলবাসীর। ইয়াসের প্রভাবে যে এলাকার বাঁধ কখনো ভাঙেনি সেখানের বাঁধ ভেঙেছে। যে লোকালয় বা গ্রামে কখনো পানি ওঠেনি সেখানে লোনা পানি উঠেছে। তবে এ দুর্যোগ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন রাতদিন কাজ করেছে। মেডিকেল টিম কাজ করেছে। যেসব বেড়িবাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে মাটি ও জিও ব্যাগ দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। মানুষ যাতে নিরাপদে থাকে, মানুষের যাতে প্রাণহানি না ঘটে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রেখেছে প্রশাসন। দিনরাত মাইকিং করে,

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন ভোলা সদরের ইউএনও মিজানুর রহমান

প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরিব অসহায় মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য শুকনা খাবার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক কম হয়েছে। বাংলার মানুষ এখন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে শিখে গেছে। জেনে গেছে কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালীসহ উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ নেমে আসে। থেমে থেমে বৃষ্টিপাত ও দমকা বাতাস মানুষের জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে। নদীতে জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের তুলনায় পাঁচ-সাত ফুট বৃদ্ধি পায়। হাজার হাজার গ্রাম প্লাবিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়াসহ ভারি বর্ষণ হয়। বাতাসের গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৬৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮৯ কিলোমিটার। যা দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছিল। এ পরিস্থিতিতে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়। তাপমাত্রা কমে যায় ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত।

শুধু তাই নয়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে তলিয়ে যায় সুন্দরবন। ম্যানগ্রোভ এই বনের দুবলায় ৫ ফুট পানিতে তলিয়ে যায়। সুন্দরবনের সবচেয়ে উঁচু এলাকা করমজল বন্যপ্রাণী প্রজননকেন্দ্রও পানিতে তলিয়ে যায়। তলিয়ে যায় আশপাশের হাজার হাজার চিংড়ি খামার। অতিরিক্ত পানির চাপ ও প্রচণ্ড বাতাসে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের ঝিনুক ও শুঁটকি পল্লি। এমনকি ইয়াসে বিধ্বস্ত হয়েছে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন।

সিডর, আমফান, ফণী, তিতলি, বুলবুল, তাউটে, ইয়াস কত বাহারি নাম যে এসব ঘূর্ণিঝড়ের! যেমন বাহারি নাম, তেমন বাহারি অর্থ। প্রতিবার মহাসাগরের বুকে ঘূর্ণিঝড় পাকিয়ে উঠলেই মানুষের কৌতূহল জাগে। এবারের ঝড়টির নাম কী হবে। কী-ই বা এর অর্থ। বঙ্গোপসাগরে ফুসে ওঠা এবারের ঝড় ইয়াসের নাম দিয়েছে ওমান। ইয়াস আসলে একটি পার্সি শব্দ। এর অর্থ জুঁই ফুলের মতো সুগন্ধি সাদা কোনো ফুল। নামের মধ্যে মধুরতা, সৌম্য ভাব থাকলেও কাজে কিন্তু এর ঠিক উলটো। কারণটা সবার জানা। এখন প্রশ্ন কারা কিংবা কীভাবে হয় এসব ঝড়ের নামকরণ?

নামকরণের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে এশিয়ার তেরোটি দেশ জড়িত। দেশগুলো হলো– বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। ২০১৮ সালের পর থেকে ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, কাতার এবং ইয়েমেন এর সদস্য হয়। প্রতিবার ১৩টি দেশ ১৩টি করে নাম প্রস্তাব পাঠায়। সবমিলিয়ে নামের ভাণ্ডারে জমা হয় ১৬৯টি নাম। এসব নামের মধ্য থেকে বাছাই করে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়টির নামকরণ করে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি। কারণ আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানুষকে সতর্ক করার জন্য একটি নাম খুবই জরুরি। নাম দিয়ে ঝড়গুলোর ধারাবাহিক ইতিহাস সংরক্ষণ এবং শনাক্ত করতে সুবিধা হয়।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস আসার আগে এ ঝড়ের নামকরণের জন্য উল্লিখিত ১৩টি দেশ মোট ১৩টি করে ১৬৯ নাম পাঠায়। এখন নিচ থেকে জেনে নেওয়া যাক কোন দেশ কী নাম পাঠিয়েছিল।

বাংলাদেশ : নিসর্গ, বিপর্যয়, অর্ণব, উপকূল, বর্ষণ, রজনী, নিশীথ, ঊর্মি, মেঘলা, সমীরণ, প্রতিকূল, সরবর, মহানিশা।

ভারত : গাতি, তেজ, মুরাসু, আগ, ভায়ুম, ঝড়, প্রবাহ, নীড়, প্রভানজান, ঘূর্ণি, আমবুদ, জালাদি, ভিগা।

ইরান : নিভার, হামুন, আগভান, সিপান্দ, বুরান, আনাহিতা, আজআর, পোয়ান, আরশাম, হেনজামি, সাভাস, তাহামতান, তুফান।

মালদ্বীপ : বুরিভি, মিদহিল, কানি, ওডি, কিনাউ, এন্ধেরি, রিয়াউ, গুরুভা, কুবাংগি, হোরাংগু, থুনডি, ফানা।

মিয়ানমার : তুয়াতি, মিগজায়ুম, নাগামান, কাজাথি, যাবাগজি, ইউয়ুম, মউইহু, কাউই, পিংকু, জিনগাউন, লিনইওনি, কাইকান, বাউপা।

ওমান : ইয়াস, রিমাল, সাইল, নাসিম, মুথন, সাদিম, দিমা, মানজর, রুকাম, ওয়াতাদ, আল-জারয, রাবাব, রাদ।

পাকিস্তান : গুলাব, আসনা, সাহাব, আফসান, মানাহিল, সুজানা, পারওয়ায, জান্নাতা, সারসার, বাদবান, সাররাব, গুলনার, ওয়াসেক।

কাতার : শাহীন, ডানা, লুলু, মউজ, সুহাইল, সাদাফ, রিম, রায়হান, আনবার, ওউদ, বাহার, সাফ, ফানার।

সৌদি আরব : জাওয়াদ, ফেনগাল, ঘাজির, আসিফ, সিদরাহ, হারিদ, ফাইদ, কাসির, নাখিল, হাবুব, বারেক, আরিম, ওয়াবিল।

শ্রীলঙ্কা : আসানি, শাক্তি, জিগুম, গগনা, ভারামভা, গাজানা, নিবা, নিনাদা, ভিদুলি, ওঝা, সালিথা, রিভি, রুদু।

থাইল্যান্ড : সিতারাংগ, মনথা, থিয়ানুট, বুলান, ফুতালা, আইয়ারা, সামিংগ, কারইসন, মাতচা, মাহিংসা, ফারিওয়া, আসুরি, থারা।

আরব আমিরাত : মানদউস, সেনইয়ার, আফুর, নাহ-হাম, কুফফাল, দামান, দিম, গারগুর, খুব, দিগল, আথমাদ, বুম, সাফার।

ইয়েমেন : ব্রম, শুকরা, ফারতাক, দারসাহ, সামহাহ, বাকহুর, ঘাওয়েযি, হাউফ, বালহাফ, মোকহা, দিতওয়াহ, দিকসাম, সিরা।

পরিসংখ্যানে প্রকাশ, দেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ১৬ হাজার ৬০০ কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে। এর মধ্যে উপকূল এলাকায় রয়েছে ৫ হাজার ৭৯৭ কিলোমিটার। এসব বাঁধ অনেকটাই পুরনো। সেগুলো পুনর্নির্মাণ, প্রশস্ত ও উঁচু করা দরকার। বিশেষজ্ঞের মতে, উপকূলীয় নদনদীর ভাঙনপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করে বাঁধ নির্মাণ এবং পুরনো বাঁধ সংস্কার জরুরি। ক্ষেত্রবিশেষে ৬ থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিটার বাঁধ উঁচু এবং টেকসই করে নির্মাণ করা দরকার। টেকসই বাঁধ নির্মিত হলে উপকূল ও উপকূলের চরাঞ্চলের জীবন ও জীবিকার গতি বাড়বে। আশার কথা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য ডেল্টা প্ল্যানের আওতায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোয় মূল চ্যালেঞ্জের বিষয় থাকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য সহায়তা দেওয়া। বাংলাদেশ সরকার এজন্য আগে থেকেই সচেতন। সরকারি সাহায্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। গোখাদ্য ও শিশু খাদ্যের জন্য সরকারি বরাদ্দ রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস চলে গেলেও রেখে গেছে ক্ষতচিহ্ন। দেশের উপকূলীয় নয় জেলার ২৭টি উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো হলো– সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাগুলো হলো– শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, আশাশুনি, কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, শরণখোলা, মোংলা, মোড়লগঞ্জ, মঠবাড়ীয়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, চরফ্যাশন, মনপুরা, দৌলতখান, বোরহানউদ্দীন, ভোলা সদর, হাতিয়া, রামগতি এবং কমলনগর।

উল্লিখিত এলাকায় খাবার পানির উৎস মূলত পুকুরের পানি। কিন্তু নদীর লোনা পানিতে নষ্ট হয়ে যায় বেশির ভাগ মিষ্টি পানির পুকুর। এখন উপায় কী? কারণ উপকূলীয় এসব এলাকায় টিউবওয়েলের পানিও লবণাক্ত। সেইসঙ্গে আয়রন। যে কারণে ওই পানি খাওয়া যায় না। এজন্য মিষ্টি পানির আধার পুকুর বাঁচাতে উপকূলীয় এলাকার নারী-পুরুষ দ্রুত বাঁধ সংস্কারের চেষ্টা করেছে, যাতে সুপেয় পানির পুকুরগুলোতে জোয়ারের পানি না ঢুকতে পারে। সাময়িকভাবে সংস্কার করা এসব বাঁধ জলোচ্ছ্বাস হলেই আবার ভেঙে যেতে পারে। এজন্য ভাঙন কবলিত উপকূলীয় এলাকার মানুষ সরকারের কাছে স্থায়ী এবং টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছে।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী পরিচালক, বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি

বাংলাদেশ ৭৬তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। ৭ই জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে বাংলাদেশ সর্বসম্মতিক্রমে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে সহসভাপতি নির্বাচিত হয়। একবছর মেয়াদের এই দায়িত্ব এবছর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। বাংলাদেশ ছাড়া এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অন্যান্য সহসভাপতি হলো–কুয়েত, লাওস ও ফিলিপাইন।

নির্বাচনে বিজয় লাভ করার পর এক প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, 'বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতার ধারক ও বাহক এবং বর্তমান বিশ্বের জটিল চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসী। উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে বাংলাদেশ তার নীতিগত ও গঠনমূলক অবস্থান বজায় রেখেছে। বহুপক্ষীয় ফোরামে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ওপর যে আস্থা রাখে, এই নির্বাচন তারই বহিঃপ্রকাশ'। উল্লেখ্য, মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ ৭৬তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বিশ্ব এখন কোভিড-১৯ মহামারি ও এর বহুমাত্রিক প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে পূর্ণাঙ্গ বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সুচিন্তিত মতামত প্রদান ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্বশীল অঙ্গ হিসেবে সাধারণ পরিষদ কাজ করে থাকে। সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ মেয়াদে ৭১তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে বাংলাদেশ সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রতিবেদন : পি আর শ্রেয়সী শ্যামা

কবি লুইজ গ্লিকের কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বিশ্বজনীনতা

মো. ঈমাম হোসাইন

লুইজ এলিজাবেথ গ্লিক যুক্তরাষ্ট্রের একজন কবি ও প্রবন্ধকার। ২০২০ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪৩ সালের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্কে লুইজ গ্লিকের জন্ম। বেড়ে উঠেছেন লং আইল্যান্ডে। বাবা ড্যানিয়েল গ্লিক হাঙ্গেরীয় ইহুদি আর মা বিয়েট্রেস গ্লিক রাশিয়ান ইহুদি। দুই বোনের মধ্যে তিনি বড়ো। স্কুল জীবনে ভুগেছিলেন অ্যানারেক্সিয়া নার্ভালসা রোগে। এজন্য বছর সাতেক থেরাপি নিতে হয়েছে তাঁকে। তিনি সারা লরেন্স কলেজ এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন; যদিও কোনো ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি। বর্তমানে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক লেখক হয়ে কাজ করছেন।

আমার প্রতি তোমার এতটুকু করুণার জন্য
মনে করো না যে আমি কৃতজ্ঞ নই।
আমি খর্বাকৃতির করুণা পছন্দই করি না,
বরং বৃহৎ আকারের চেয়েও
এইসব করুণা আমার বেশিই প্রিয়,
যা তোমাকে চোখে চোখে রাখে,
নেকড়ের জ্বলজ্বলে দৃষ্টির মতো,
অপেক্ষায় জাগিয়ে রাখে
দিনের পর দিন
নিঃশেষ হবার আগ পর্যন্ত।
[কবিতা: কৃতজ্ঞতা (অনুবাদ)]

লুইজ গ্লিকের কবিতার বুনন এক ভিন্ন শিল্পশৈলী– যা আমাদের প্রচলিত সাহিত্য মাপকাঠিতে অপরিচিত। তাঁর গদ্য কবিতা ছন্দ, অন্ত্যমিল, উপমা ও চিত্ররূপময়তার সঙ্গে ধ্বনি মাধুর্যের সম্মিলনে যে কবিতা পড়তে আমরা অভ্যস্ত, লুইজ গ্লিকের কবিতার শৈলী তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল গদ্য; ইতিহাস, গ্রিক, রোমান মিথোলজি আর প্রকৃতির সমন্বয়ে তাঁর রচনা। কবিতার ভাষা সোজাসাপটা, অনেকটা সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক শিষ্ট ভাষা। এজন্য বলা যেতে পারে, শব্দ চয়নেও এমন কোনো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না যা বিশ্ব পাঠকদের চমৎকৃত করতে পারে।

তাঁর কবিতার বহুলাংশে বিস্তার করে আত্মজৈবনিক উপাদানসমূহ। সেখানে পাঠক প্রত্যক্ষ করবেন এক ধরনের অসহায়ত্ব, একাকিত্ব, নিস্তব্ধতা বা মৃত্যুচেতনা, যা মানব অস্তিত্ব প্রকাশে বা বিচারে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যা তাঁর চোখ দেখে, তা-ই তিনি তুলে ধরেন গদ্যের বুননে। ফলে ব্যক্তি লুইজ, তাঁর পরিবার, সমাজ উঠে আসে তাঁর কবিতায়।

কবিতায় তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু, আবার কখনো ভয়ার্ত, অনিশ্চিত, দ্বিধা ভারাক্রান্ত। সমকালীন মেধাবী কবি লুইজের কবিতা বিখ্যাত হয়ে উঠে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষারীতি, সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি, গভীরতর অনুভূতির জন্য, যার মাধ্যমে তাঁর একাকিত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুবোধ ফুটে উঠে। 'সূর্যাস্ত' কবিতায় তাই আমরা দেখতে পাই:

সূর্যাস্তের সাথে সাথেই একজন
খামার-শ্রমিক পুড়িয়ে ফেলছে মৃত পাতা
কোনো বড়ো ঘটনা আদৌ নয়,
কিছু আগুন মাত্র
জাঁদরেল মহাজনের হস্তকবলিত
একটি পরিবারের মতো নিয়ন্ত্রিত
ক্ষুদ্র একটি ঘটনা
[কবিতা: সূর্যাস্ত (অনুবাদ)]

লুইজ গ্লিক কবিতার পটভূমি তৈরি করেন কথ্য কিংবা ব্যবহারিক ভাষায়। বাক্যে শব্দ স্থাপনার ক্রম কখনো কখনো মনে হতে পারে অযথার্থ। কখনো সম্পূর্ণ কবিতা পাঠের আগে উদ্দিষ্ট অর্থ স্পষ্ট হয় না। লুইজের প্রথম জীবনের রচনায় ব্যর্থ-সম্পর্ক পরবর্তী শোক, পারিবারিক বিপর্যয়, ব্যক্তি অস্তিত্বের সংকট এবং শেষ ভাগের রচনায় ব্যক্তি-যন্ত্রণার বয়ান বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। পাঠকমহল তাঁর কবিতায় কল্পযাত্রার মাধ্যমে জীবনের গভীরতর এবং একান্ত অনুভূতির সন্ধান পাবেন।

কবি লুইজ গ্লিক তাঁর কবিতায় সাবলীল আর ব্যতিক্রমী ভাষাশৈলী দিয়ে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেন, যা একাধারে হয়ে ওঠে স্থানিক ও বৈশ্বিক অনুষঙ্গ। কবিতায় নিজ স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্বজনীনতায় রূপ দিতে সক্ষম হন। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত *দ্য ওয়াইল্ড আইরিস* (১৯২২) গ্রন্থে ভিশনারি কাব্যসুরের খোঁজ পাওয়া যায়, যা ফুল-মালী-ঈশ্বরের মেলবন্ধনের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর রচনায় যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভব আর প্রকৃতি দিয়ে নিজ জীবন আর স্বপ্নহীনতার চিত্র আঁকেন। *ভিটা নুভা* (১৯৯৯) গ্রন্থকে তাই তাঁর সংসার বিচ্ছেদের রূপক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

রোদ্দুরের এমন ঝিলিক
বরফগুলোও হীরের মতো জ্বলছে,
জীবন আলো-হাসি হাসছে আর
উষ্ণতায় ভরে আছে আমার সর্বস্ব।

কার ইঙ্গিতে এত আলো, এত হাসি
কে এই আনন্দের কারিগর!
কাঁধের ওপর দিয়ে বরফ ছুড়ে দিলাম
এরা সব আমারই থাকুক।
[কবিতা: প্রেসিডেন্টস ডে (অনুবাদ)]

অসামান্য কাব্যভাষা, কাব্যকথা ও কাব্যশৈলী গ্লিকের কবিতাকে করে তুলে বিশ্বজনীন, মর্যাদা দেয় একজন বিশুদ্ধ গীতিকবির। মানবজীবনের নানা সংকট, ক্রান্তি, অভীপ্সা, প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্নতা তাঁর কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ। তাঁর বেশিরভাগ রচনাই উপকথা ও ধ্রুপদি মিথের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত। কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিশ্বজনীনতার যোগসূত্র স্থাপন করেন তিনি। গ্লিকের কাব্যিক উচ্চারণ সুমধুর ও আপোশহীন ভাষায় সুরের ঝংকার তুলে। 'সুখ' কবিতা পাঠে তার উদাহারণ পাই:

দুজন শুয়ে আছে রাত্রির কোলে
সাদা বিছানার চাদরে শুয়ে আছে দুজন মানুষ।
ভোর খুব কাছে,
এইবার ওদের ঘুম ভাঙবে
মাথার কাছে লিলি জাগছে ফুলদানিতে
সূর্যের আলো ওদের পানপাত্রে তৈরি
এখনই চুমুক দেবে।
[কবিতা: সুখ (অনুবাদ)]

১৯৬৮ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ফার্স্টবর্ণ* প্রকাশের মধ্য দিয়েই তিনি কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। খুব অল্প সময়েই মার্কিন সমকালীন সাহিত্য জগতে নিজের আলাদা অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন। তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থও বেরিয়েছে। তন্মধ্যে *প্রুফস অ্যান্ড থিউরিজ্* (১৯৯৪) এবং *আমেরিকান অরিজিনালিটি* (২০১৭) বিখ্যাত। হাস্যরস ও তীক্ষ্ণ কৌতুকের সংমিশ্রণও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। যদিও বেশিরভাগ কবিতায় আত্মজীবনীমূলক উপাদান ফুটে ওঠে, কিন্তু তাকে কিছুতেই স্বগতোক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তিনি সর্বজনীনতাকে তুলে ধরতে চান কবিতায়।

পাঠকমহলে প্রশংসিত বইগুলোর মধ্যে *দ্য ওয়াইল্ড আইরিস* (১৯৯২) অন্যতম। এই বইয়ে গ্লিক 'স্নো ড্রপস বা তুষার ফোঁটা' শিরোনামের একটি কবিতায় শীতের পরে মানবজীবনের অলৌকিক প্রত্যাবর্তনের যে স্বপ্নিল বর্ণনা দিয়েছেন, তা পাঠকের চিন্তার জগৎকে আন্দোলিত করে। ২০০৬ সালে তাঁর রচিত আভেরনোও দুর্দান্ত একটি কবিতার বই, যেখানে মা মেরির বংশোদ্ভূত হেডেসের বন্দিদশায় বসন্তের দেবী পার্সেফোনের একটি কল্পিত মিথের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ *ফেইথফুল অ্যান্ড ভার্চুয়াস নাইট* (২০১৪)।

নোবেল পুরস্কারের একশ বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসে মাত্র ১৬ জন নারী সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন; সঙ্গত কারণে এই তালিকায় গ্লিক সর্বশেষ অবস্থানে। লুইজ গ্লিকের কবিতায় সাহিত্যিকগণ রাইনের মারিয়া রিলকে এবং এমিলি ডিকিনসনকে খুঁজে পান। সেদিক থেকে দেখলে তিনি পশ্চিমা বিশ্বের মূল ধারার কবিতা থেকে খুব বেশি বিচ্ছিন্ন নন।

লুইজ গ্লিক বর্তমানে বাস করছেন ম্যাসাচুসেটসের ক্যামব্রিজ শহরে। তিনি বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পুরস্কার পেয়েছেন। *দ্য ওয়াইল্ড আইরিস* কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৯৩ সালে তিনি পুলিৎজার পুরস্কার পান। কাব্যসংগ্রহ *পোয়েমস* ১৯৬২-২০১২-এর জন্য ২০১২ সালে লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০১৪ সালে *ফেইথফুল অ্যান্ড ভার্চুয়াস নাইট* কাব্যগ্রন্থের জন্য জাতীয় সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। তর্ক কিংবা বিতর্ক হতেই পারে, তথাপি বিশ্বসাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর নক্ষত্রে পরিণত হবেন লুইজ এলিজাবেথ গ্লিক।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও নিয়ন্ত্রক/অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ, বিটিভি, ঢাকা

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ফিলিপাইনে স্মারক খাম ও ডাকটিকিট প্রকাশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে স্মারক খাম ও বিশেষ ডাকটিকিট অবমুক্ত করেছে ফিলিপাইন পোস্টাল করপোরেশন ফিলপোস্ট। ৯ই জুলাই ফিলিপাইন পোস্টাল করপোরেশন ও ফিলিপাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাঙ্গণে উদ্‌বোধনী খাম ও ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন ফিলপোস্ট পোস্টমাস্টার জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নরম্যান ফুলগেনশিও এবং ফিলিপাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়াম। কোভিড-১৯ অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য পালনীয় সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সীমিত পরিসরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ফিলপোস্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যে পোস্টমাস্টার জেনারেল নরম্যান ফুলগেনশিও ফিলপোস্টকে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে অংশীদার করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুজিব লোগো সংবলিত এই ডাকটিকিট ও খাম ফিলিপিনোদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করবে। জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতার নীতি, আদর্শ, ত্যাগ ও জীবনসংগ্রাম পৃথিবীর সব মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এই ডাকটিকিট ও খাম প্রকাশের মাধ্যমে ফিলিপাইন ও বহির্বিশ্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনাদর্শ সাধারণ ফিলিপিনোদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হবে। তিনি জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে দূতাবাসের সাথে যোগদানের জন্য ফিলপোস্টকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত উদ্‌বোধনী খাম ও ১৭ ফিলিপাইন পেসো মূল্যমানের ডাকটিকিট ডিজাইন করেছে ফিলপোস্ট ক্রিয়েটিভ টিম।

প্রতিবেদন : মাহবুবুর রহমান

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার

জান্নাতুল ফেরদৌস

বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের সুন্দরবন হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল। সুন্দরবনের ৬২ শতাংশ বনাঞ্চল বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে। এ বনের জল-স্থলে বাঘের জন্য রয়েছে প্রচুর বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য– হরিণ, বানর, কাঠবিড়ালী, গিরগিটি, শুশুক, ভোদড়, কুমির ইত্যাদি।

বন বিভাগের কর্মকর্তারা জরিপের তথ্য উল্লেখ করে বলেন, সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের ৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৪ হাজার ৮৩২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাঘ বিচরণ করে। এদের বিচরণের প্রধান ক্ষেত্র বাগেরহাটের কটকা, কচিখালী ও সুপতিসহ খুলনার নীলকমল, পাটকোস্টা, গেওয়াখালী এবং সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জ, দোবেকি ও কৈখালি এলাকা।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ১৩টি দেশে বাঘ রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলো হলো– ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া। বাংলাদেশের বিশ্ব খ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রধান আবাসস্থল সুন্দরবন হলেও জলবায়ু পরিবর্তনে পানি-মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, শিকারি ও দস্যুদের দৌরাত্ম্য, অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি ও খাদ্য সংকটসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বেশ কিছু কারণে বাঘের বাসযোগ্য পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে।

বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সালের গবেষণায় সুন্দরবনে বাঘ ছিল ৪৪০টি। ২০১৫ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ গণনা করা হয়। এতে ১০৬টি বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঘ প্রকল্প ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ গণনার কাজ শুরু করে। যার ফলাফল ২০১৮ সালেই প্রকাশ করা হয়। ওই ফলাফলে সুন্দরবনের ১১৪টি বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ৩ বছরের ব্যবধানে সুন্দরবনে ৮টি বাঘ বৃদ্ধির চিত্র ফুটে ওঠে।

বিশ্ব বাঘ দিবস ২৯শে জুলাই। বাঘ টিকে আছে বিশ্বে এমন ১৩টি দেশে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ২৯শে জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন অংশে গত ৩ বছরে বাঘের সংখ্যা ১০৬ থেকে বেড়ে বর্তমানে ১১৪টি হয়েছে। অর্থাৎ ৩ বছরে সুন্দরবনের বাঘ বেড়েছে ৮টি।

বন বিভাগ জানিয়েছে, সুন্দরবনের বাঘের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রবৃদ্ধির প্রধান বাধাগুলোকে চিহ্নিত করে অবাধ বিচরণ ও আবাসস্থলকে নির্বিঘ্ন করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপদ প্রজনন পরিবেশ তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে-কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপে সুন্দরবনে দস্যুতা এবং চোরা শিকারিদের তৎপরতা কমেছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। এসব কারণে সুন্দরবনে আগের তুলনায় বাঘ অনেকটা সুরক্ষিত এবং বাঘের বিচরণক্ষেত্রও নিরাপদ হওয়ার ফলে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১শে মে ২০১৯ সুন্দরবনের বাঘ জরিপের ফল প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮টি। ২০১৫ সালে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। জরিপের এ ফল প্রকাশ করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন। ২১শে মে ২০১৯ শেরে বাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত মোট চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা, শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের মোট ২,৪৬৪টি ছবি পাওয়া যায়। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কিলোমিটার এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। ইউএসএইডের অর্থায়নে বেঙ্গল টাইগার কনজারভেশন অ্যাক্টিভিটি (বাঘ) প্রকল্পের আওতায় এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এসইসিআর মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া গেছে ২.৫৫+০.৩২। সুন্দরবনের বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র চার হাজার ৪৬৪ কিলোমিটার এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। জরিপে দেখা গেছে, বাগেরহাটের শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১.২১টি বাঘ রয়েছে। জরিপে বন বিভাগকে সহযোগিতা করেছে ওয়াইল্ড টিম, যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথ সোনিয়ান কনজারভেশন বায়োলজি ইনস্টিটিউট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। সুন্দরবনের বাঘের শিকার-প্রাণীর মধ্যে চিত্রা হরিণ, শুকর, বানর প্রভৃতি রয়েছে। বাঘের সংখ্যা বাড়াতে হলে বাঘের শিকার-প্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। বাঘ সংরক্ষণে সরকারের নেওয়া গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মেনে চলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

হেপাটাইটিস প্রতিরোধে সচেতনতা

অনিল কুমার

প্রতিবছর ২৮শে জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এবং ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্সের আহ্বানে বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস' পালিত হয়। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বজুড়ে হেপাটাইটিস রোগ নির্ণয়, তার প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় সচেতনতা গড়ে তোলা। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের আবিষ্কার করেন। তিনি এই রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করেন এবং টিকাকরণ শুরু করেন। চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁর এই অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে ২৮শে জুলাই তাঁর জন্মদিনে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন করা হয়। এবারের বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: 'Hepatitis Can't Wait'.

হেপাটাইটিস হচ্ছে– লিভার সেলের (কোষের) এক ধরনের প্রদাহ। এতে লিভার সেলের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। একটি হচ্ছে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বা তাৎক্ষণিক আর অন্যটি ক্রনিক হেপাটাইটিস বা দীর্ঘমেয়াদি। সাধারণত পাঁচ প্রকারের হেপাটাইটিস ভাইরাস হয়– হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই ভাইরাস। সারা বিশ্বে লিভার ক্যানসারের ৮০ শতাংশই দায়ী হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'। বাংলাদেশে হেপাটাইটিস 'এ' এবং 'ই' বেশি ছড়ায় (খাদ্য ও পানীয় জল) মূলত হাইজিন এবং সেনিটেশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে। তবে আশ্চর্যজনক তথ্য হলো, হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই তাদের শরীরে বাহিত ভাইরাসের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত নয় বা জানে না। এই দুই ভাইরাসকে বলা হয় 'নীরব ঘাতক'। হেপাটাইটিস 'ডি' সাধারণত হেপাটাইটিস 'বি'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এজন্য হেপাটাইটিস 'এ', 'ই', 'বি' ও 'সি' ভাইরাস নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু টেস্ট করাতে হয়। হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'-এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্ক্রিনিং টেস্ট করার পর পজিটিভ হলে নিশ্চিতকরণ (কনফারমেটরি) টেস্ট করতে হয়। এরপর ভাইরাস দুটির ক্ষতিকর অবস্থা (ইনফেকটিভিটি) জানতে হেপাটাইটিস 'বি'-এর ডিএনএ এবং হেপাটাইটিস 'সি'-এর আরএনএ পরীক্ষা করতে হয়। 'সি'-এর ক্ষেত্রে 'জিনোটাইপ' করতে হয়।

বিশ্বে প্রায় ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ হেপাটাইটিস 'বি' অথবা 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রতি ১২ জনের মধ্যে একজন হেপাটাইটিস 'বি' অথবা 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। অবাক হবার বিষয় যে, এদের প্রায় ২৯০ মিলিয়ন (৬০ ভাগ থেকে ৭০ ভাগ) মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের জানা নেই। এই দুই ভাইরাসজনিত লিভার রোগের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১.৪ মিলিয়ন মানুষ এবং প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' সংক্রমণের বিষয়ে ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ২০২০ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভাইরাস আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের, রক্ত সঞ্চালন, একই সুচের বহুল ব্যবহার, অসচেতনভাবে দাঁতের চিকিৎসা এবং অন্যান্য সার্জারির জন্য অপরিশোধিত বা আনস্টেরালাইজড যন্ত্রের ব্যবহার মূলত হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' সংক্রমণের জন্য দায়ী।

হেপাটাইটিস 'বি'-এর বড়ো সমস্যা হলো, এর তেমন কোনো উপসর্গ নেই এবং লিভার অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত রোগীরা বিষয়টি তেমন টের পায় না। তবে 'বি' ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের দুই থেকে তিন মাস পর এর লক্ষণ ও উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে, যেমন পেট ব্যথা, গাঢ় রঙের প্রস্রাব, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব, শরীরের চামড়া হলুদ হয়ে যাওয়া, চোখ সাদা বা ফ্যাকাসে হওয়া ইত্যাদি। হেপাটাইটিস 'বি' হলে লিভারে ক্ষত বা লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যানসার, লিভারের কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়া, হেপাটাইটিস 'ডি'-এর সংক্রমণ, কিডনির সমস্যা, রক্তের ধমনিতে প্রদাহ ইত্যাদির মতো মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

হেপাটাইটিস 'বি' পজিটিভ ধরা পড়লে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অনেক সময় কোনো ধরনের ক্ষতি ছাড়াই 'বি' ভাইরাস বছরের পর বছর শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। আবার লিভারে এই ভাইরাসের ইনফেকশনও থাকতে পারে। তবে এগুলো সক্রিয় কি-না এবং এর কারণে লিভারে কোনো ক্ষতি হয়েছে কি-না বা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি-না তা জানতে কিছু পরীক্ষা যেমন : HBeAg, AST (SGOT), ALT (SGPT), HBV-DNA, পেটের আলট্রাসাউন্ড ও এন্ডোসকপি (Endoscopy of upper GIT) করা দরকার। ভাইরাস সক্রিয় থাকলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে হবে। হেপাটাইটিস ভাইরাসের মধ্যে হেপাটাইটিস 'এ' ও হেপাটাইটিস 'বি'-এর টিকা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। যারা হেপাটাইটিস 'বি' দ্বারা আক্রান্ত নন, তাদেরকে এই ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টিকা নিতে হবে। জন্মের পর থেকে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত যে কেউ এই টিকা নিতে পারে। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আগে যদি কোর্স পূর্ণ করে টিকা নেওয়া হয়, তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে ৯০ ভাগ নিরাপদ থাকা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী হেপাটাইটিস নির্মূল বা 'এলিমিনেট হেপাটাইটিস' কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে হেপাটাইটিস নির্মূল করা, যাতে প্রায় ৭.১ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এরই আলোকে ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স ২০১৬ সালের ২৮শে জুলাই ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস দিবসে 'নো হেপ' বা হেপাটাইটিস মুক্ত বিশ্ব কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে হেপাটাইটিসের প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ ২০০৮ সাল থেকে জেনেভায় অবস্থিত ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতিবছর বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জনসচেতনতামূলক বাণী দেন। করোনা মহামারির মধ্যে গত বছরের মতো এ বছরও ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দিবসটি সীমিত আকারে পালন করে। অন্যদিকে সরকার বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি হেপাটাইটিস ভাইরাস নির্মূলে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই করোনার সঙ্গে সঙ্গে হেপাটাইটিস নির্মূল ও হেপাটাইটিস মুক্ত প্রজন্মই হোক আমাদের আগামী দিনের কামনা।

লেখক : প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুন ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

প্রাণ ফিরে পাচ্ছে চিলমারী নদীবন্দর

মো. মাইদুল ইসলাম

চিলমারী বন্দরটি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক জেলা কুড়িগ্রামের একটি উপজেলা, যা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে ব্যাবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল এই চিলমারী বন্দর। এক সময় এই চিলমারী বন্দরে ভারত, বার্মা (মিয়ানমার) ও চীন থেকে অনেক জাহাজ ব্যবসায়ী এখানে নোঙর ফেলত। সেখানকার বন্দরের কর্মকর্তারা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট হিসেবে সিল মারত।

ধারণা করা হয় সেই সিল মারা থেকেই চিলমারী নামের উৎপত্তি। এ বন্দরকে ঘিরে প্রায় ৪-৫ হাজার মানুষের জীবিকানির্বাহ হতো। উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলেও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল উন্নত।

প্রাচীন এ বন্দরটি ১৮৫৬ সালে প্রথম ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনের শিকার হয়। ১৮৫৭ সালে চিলমারী বন্দর স্থানান্তরিত হয় চিলমারী হাট ও গোলার কাছাকাছি। এই বন্দর থেকে ভারতের আসামের ধুবড়ী নৌবন্দর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে পণ্য নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বন্দরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বড়ো বড়ো গুদাম। দেশের নামিদামি পাট কোম্পানিগুলো এ বন্দরে এসে অফিস খুলে পাট ক্রয় করত।

১৯২৬ সালে ব্রহ্মপুত্র নদের ব্যাপক ভাঙন দেখা দিলে বন্দরটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে থানাহাটে স্থানান্তর করা হয় উপজেলা অফিস ও আদালত। চিলমারী বন্দরটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে নদীর পাড়ে অস্থায়ীভাবে পণ্য খালাস হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার বন্দরটি নতুনভাবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিলমারীকে নদীবন্দর হিসেবে ঘোষণা করেন এবং অন্যান্য নদী ও সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে একে সংযুক্ত করার ওপর জোড় দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওই সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন নৌপরিবহণ মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান বন্দর পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

চিলমারী নদীবন্দরের অবকাঠামো, সুবিধাদি নির্মাণের নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এজন্য ঐ এলাকার রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারি, নয়ারহাটে নদীবন্দর নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভারতের আসাম, নেপাল ও ভুটানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনে অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে চিলমারীকে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

৮ই জুন ২০২১ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় কুড়িগ্রামের চিলমারীতে নদীবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ায় ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিএ। এ প্রকল্পের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. ৩৩ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নিরাপদ নৌ চলাচল চ্যানেল তৈরি

২. ২ হাজার ৪৮০ বর্গমিটার আরসিসি জেটি তৈরি

৩. ৩৭৯ দশমিক ৮ বর্গমিটার স্টিল জেটি তৈরি

এছাড়া ৭৮৫ মিটার তীর রক্ষা, এক হাজার ৩০৪ বর্গমিটার গুদাম, ৫টি পন্টুন বন্দর ভবন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি ইত্যাদি থাকবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক

ভাগাভাগি

নাসিম সুলতানা

আজ অনেক দিন পর এজাজ সাহেব তার স্ত্রীকে কাছে পেয়েছেন। তিনি চাকরি থেকে অবসরে গিয়েছেন দুবছর হলো। এর মধ্যে কত কী ঘটে গেল। তার চার ছেলে। চারজন লেখাপড়া শিখে যার যার জায়গায় ভালো আছে। বড়ো ছেলে ডাক্তার, মেজো ছেলে ল'ইয়ার, সেজো ছেলে প্রফেসর এবং ছোটো ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ভালো নেই তাদের বাবা-মা। তারা ভাইরা মিলে ঠিক করেছে বাবা এক সপ্তাহ বড়ো ছেলের বাসায় থাকলে মা থাকবে মেজো ছেলের বাসায়। বাবা-মা দুজনে ভাগাভাগি করে চার সপ্তাহ চার ছেলের বাসায় থাকবে, কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিল।

ওদের কত সমস্যা বাবা-মাকে নিয়ে। মা যে কত কষ্ট করে তাদের মানুষ করেছে। সংসারে বাড়তি টাকা জোগাতে তাকে সেলাইয়ের কাজ করতে হতো। আর এজাজ সাহেব সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। বেতনটা পেয়েই স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলতেন, শোন আমেনা কেমনে চালাবা আমি জানি না।

আমেনা বেগম হেসে বলত তুমি চিন্তা করো না। আমাদের বাচ্চারা তো পড়ালেখায় খুব ভালো। ওরা তো এ পর্যন্ত রেজাল্ট ভালো হওয়ার কারণে ফ্রি বেতনেই পড়ালেখা করছে। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। এভাবে সন্তানদের উঁচু সিড়িতে তাদের এই বাবা-মাই নিয়ে এসেছে।

আমেনা বেগম ভাবছে আর ভাবছে। তার ছেলেদের কী শিক্ষা সে দিয়েছে। আজ তারা বাবা-মা'কে ভাগাভাগি করে। বাবা-মার এখন বয়স হয়েছে। তারা দুজন এক জায়গায় থাকবে। দুজনে জীবনের সুখদুঃখের গল্প করবে। দুজনে এক সাথে খাওয়াদাওয়া করবে। জীবনে যে কষ্ট তারা করেছে তার গ্লানিটা দূর করতে এখন তারা নাতিনাতনি নিয়ে খেলবে।

আর এজাজ সাহেব জানালার ধারে বসে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছে চার ছেলের মধ্যে একটাও কি ভালো হলো না! যে হাসিমুখে তাদের বাবা-মাকে রাখবে। বাবা-মাকে কি ভাগ করা যায়! এটা কি জমি!

যাক আর কোনো চিন্তা না। তিনি আমেনা বেগমকে বললেন, আমরা আর ভাগাভাগি হতে চাই না, আজ এ ছেলের বাসায় আমি আর তুমি আর এক ছেলের বাসায়–এ অসহ্য। আর আমার ওষুধগুলোও তো ঠিকমতো খাওয়া হয় না। কে মনে করিয়ে দিবে বলো ? এদের তো বুড়ো বাবাকে দেখার সময় নেই। ওষুধ কিনে দিয়েছে এটাই বেশি। শোন আমেনা, আমি আর একটি বড়ো ভুল করে ফেলেছি– গ্র্যাচুইটির টাকাটা ওদের চারজনকে ভাগ করে দিয়ে। তো তোমাকে বলছি চলো আমরা গ্রামে যাই। আমি পেনশনের যে টাকাটা পাব তাতে দুজনের ভালোমতো সংসার চলে যাবে। আগে হলে আমেনা বেগম গ্রামে যাওয়ার ব্যাপারে না করত। কিন্তু এখন ছেলে ও বউদের তিক্ত ব্যবহারে তিনি বেদনায় মুহ্যমান হয়ে গেছেন। স্বামীর কথায় তিনি বললেন, তাই চলো। কবে যাবে।

এজাজ সাহেব বললেন, শুভ কাজ দেরি করতে নেই। গ্রাম আমাদের ডাকছে। যেখানে তুমি খোলা হাওয়ায় ধানক্ষেতের পাশে হাঁটতে পারবে। আমরা পুকুরের পাশে বসে হাঁসদের সাঁতার কাটা দেখব, পাখিদের মিষ্টি মধুর গান শুনব।

আর আমাদের পেনশনের টাকা, যা জমি ও পুকুর আছে তা দিয়ে ভালোই চলে যাবে। ওখানে আমাদের কেউ ভাগাভাগি করবে না। আজ এ বাসায় তো এক সপ্তাহ পর অন্য বাসায়। শোন আমেনা, যেখানেই থাকব দুজন একসঙ্গে থাকব।

আমেনা ভাবছে অন্য কথা। কত কষ্ট করে তিনি না খেয়ে না পড়ে ছেলেদের মানুষ করেছে। কত ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা মনে মনে গেঁথেছেন। এখন সব ভুল। নাতিগুলোও কেমন অন্যরকম। দাদা-দাদুর কাছে আসে না। অবশ্য ওদের যে শিক্ষা দিবে তাই তো তারা করবে? আমি ছেলেদের এত ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করে ওদেরকে কি প্রকৃত মানুষ বানাতে পেরেছি?

যাক স্বামীর কথায় তার স্বস্তি ফিরে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে– কখন যাবে বলো?

এজাজ সাহেব বলে– এখনই, এই মুহূর্তে। তাড়াতাড়ি কাপড়গুলো গুছিয়ে নাও।

অন্য সময় হলে আমেনা বেগম ছেলেদের রেখে গ্রামে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করত। সেই আমেনা বেগম একটা আশ্রয় খোঁজার জন্য আবার যুদ্ধে রওনা দিচ্ছে। তার চোখ বেয়ে বেদনার দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ❑

হ্যালো?

সায়েরে নাজাবি সায়েম

– হ্যালো ? হ্যাঁ বলো।

– কী বলব?

– যে-কোনো কিছু। তোমার কণ্ঠ শুনতে ভারি মন চাইছিল।

– আচ্ছা?

– অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল যেমন তার প্রেমিকা হ্যালোর নাম মানুষের মুখে অমর করে গেছেন, আমিও তোমার নাম ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ করে দিব। শেফালী ও রনির প্রেম হবে একটি বিখ্যাত প্রেমের উদাহরণ।

– কী বললে তুমি! অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল যেমন তার প্রেমিকা হ্যালোর নাম মানুষের মুখে অমর করে গেছেন, তুমিও আমার নাম ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ করে দেবে! ও রনি!

টেলিফোনে আলাপ চলছিল ভালোই। কিন্তু ঠিক তখনি শেফালীর পেছন থেকে কথা বলে উঠল ওর বিজ্ঞান পাগল ছোটো বোন জারা। বলল, অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছেন ঠিকই কিন্তু ফোন ধরে হ্যালো বলার প্রচলন তিনি শুরু করেননি। এবং হ্যালো নামে তার কোনো প্রেমিকা ছিলেন না। তার একমাত্র প্রেমিকা এবং স্ত্রী ছিলেন মাবেল গার্ডিনার হাববার্ড।

শেফালী কথা থামিয়ে বিস্মিত হয়ে জারার দিকে তাকিয়ে রইল ।

– শেফু? কোথায় গেলে তুমি?

– আচ্ছা রনি, জারা বলছে হ্যালো নাকি গ্রাহাম বেলের প্রেমিকার নাম নয়। এবং গ্রাহাম বেল হ্যালো বলতেন না!

রনি খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেল। জারা বলেছে তার মানে তথ্যটা অবশ্যই সত্যি। জারা খুব কম কথা বলে এবং কোনো কিছু যদি বলে তাহলে তা অবশ্যই প্রমাণসহ, তাই বাসার কেউ কোনোদিন জারাকে উলটো প্রশ্ন করে না এবং বেশ মনোযোগ দিয়েই ওর ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে। সেটা জারার হবু-দুলাভাই রনি খুব ভালো করেই জানে। এরপরও রনি প্রশ্ন করে উঠল। বলল, কে বলেছে প্রেমিকার নাম হ্যালো ছিল না? মার্গারেট হ্যালো ছিল তার প্রেমিকা...কিন্তু পরে তাদের খুব সম্ভবত বিয়ে হয়নি।

শেফালী বলে উঠল, হ্যাঁ তাই হবে। আমরাও তো ছোটোবেলায় গল্প শুনেছি যে তার প্রেমিকার নাম হ্যালো।

জারা তার চুল মুঠো করে ধরে বেঁধে নিল উঁচু করে। চশমাটা ভালো করে গুজে নিল নাকের উপরে। হাতে রাখা স্টিফেন হকিং-এর *Brief Answers to the Big Questions* বইটি টেবিলের উপর রেখে নড়েচড়ে বসল। হাতের আঙ্গুলগুলো ঝাড়া দিয়ে একসাথে এনে মুঠো করে ফেলল। প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধে নামছে। তারপর ও যা বলতে শুরু করল, তাতে শেফালী ও রনির প্রেম ইতিহাসের ইতি ঘটে যেতে পারত এবং রনি হয়তবা সারাজীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না ঐ একটি প্রশ্ন করার জন্য। কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি বরং দুইজন খুব মন দিয়ে শুনল এবং তাদের এতদিনের ভুল ভাঙতে লাগল।

সংবাদমাধ্যমকে *অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল* বইয়ের লেখক মেরি কে কারসন বলেছিলেন, বেলের এরকম কোনোও বান্ধবী ছিলেন না। এসব গুজব। ২০০৯ সালের একটি ইতিহাস নিবন্ধ অনুসারে, বোস্টনে একটি বাক ও শব্দ প্রতিবন্ধীদের স্কুলে শিক্ষকতার সময় গ্রাহাম বেলের সাথে দেখা হয়েছিল ১৫ বছর বয়সি হাববার্ডের। দশ বছরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বেল মাবেল হাববার্ডের সাথে বাগদান করেছিলেন এবং তিনি ফোনটি আবিষ্কার করার এক বছর পরেই, অর্থাৎ ১৮৭৭ সালে তারা বিয়ে করেছিলেন। মাবেল হাববার্ড ১৯২২ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গ্রাহাম বেলের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন।

– এর মানে কী?

– এর মানে, মারগারেট হ্যালো একটি কাল্পনিক চরিত্র। গ্রাহাম বেল মানুষকে শুভেচ্ছা হিসেবে হ্যালো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছিলেন কি? মোটেই না! বেল টেলিফোনের উত্তর দেওয়ার জন্য আহোই শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আহোই হচ্ছে কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে বা দূর থেকে কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যবহার করা হতো, বিশেষ করে জাহাজে বা নৌকায়। সারাটি জীবন বেল কাউকে ডাকতে আহোই ব্যবহার করেছেন, তাই এই শব্দতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী থমাস আলভা এডিসন এই শুভেচ্ছা শব্দ হ্যালো প্রচলন করেছিলেন। 'হ্যালো' শব্দটি সরাসরি এডিসনের কাছ থেকে এসেছিল যিনি টেকনো-শিষ্টাচারের প্রথম সংকট সমাধানের জন্য সোনারস সিলেবলগুলোর প্রচলন করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল এরকম: *What do you say to start a telephone conversation?*

১৮৭৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে লেখা এডিসনের একটি চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন টি.বি.এ. পিটসবার্গের সেন্ট্রাল জেলা এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ কোম্পানির সভাপতি মি. ডেভিডকে। ডেভিড পিটসবার্গ শহরে টেলিফোন চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই সময় টেলিফোনের উভয় প্রান্তে খোলা লাইন ছিল, এই সেটআপটির সমস্যা ছিল এক পক্ষ কথা বলতে চাইছে তা অন্য পক্ষ জানার উপায় ছিল না।

এডিসন এই বিষয়টির সমাধান করেছিলেন তার লেখা চিঠিতে এভাবে:

বন্ধু ডেভিড, আমি মনে করি না যে 'হ্যালো' বাদে আমাদের অন্য কোনো কল বেল লাগবে! ১০ থেকে ২০ ফুট দূরে শোনা যায় এই শব্দটি। আপনি কী মনে করেন?

চিঠির ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ জারার কী করে মনে আছে দেখে শেফালী হা করে তাকিয়ে রইল। সে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। জারা বলতে থাকল –

এর বাকিটা ছিল ইতিহাস। এডিসনের প্রতিদ্বন্দ্বী বেলের আহোই! এটি হ্যালোর সাথে হেরে গেল! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রতিষ্ঠিত প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থমাস আলভা এডিসনের পরিচালন ম্যানুয়াল অনুযায়ী হ্যালো শব্দটি গ্রহণ করেছিল। ১৮৮০ সালের মধ্যে হ্যালো জিতে যায় পুরোপুরিভাবে।

আহোইর মতনই হ্যালো ইংরেজি ভাষায় একটি অভিবাদন, যা ১৮৩৩ সাল থেকে প্রথম লিখিতভাবে সত্যায়িত হয়। *The Sketches and Eccentricities of Col. David Crocket of West Tennessee* নামক এই আমেরিকান বইটিতে হ্যালো বা Hello ব্যবহৃত হয় ১৮৩৩ সালে। অথচ টেলিফোন আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৭৬ সালে, হ্যালোর উদ্ভাবনের অনেক পরে। তারপর শব্দটি ১৮৬০-এর দশকে সাহিত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই বলে জারা লম্বা করে একটা দম ফেলল এবং শান্তভাবে হাতে ধরা বইটি পড়তে শুরু করল এমনভাবে যেন এতক্ষণ কিছুই ঘটেনি। শেফালী আমতা আমতা করতে ফোনটা কানের কাছে নিল।

– হ্যালো রনি? তুমি আছ?

– আবার হ্যালো! ধুর! শেফালী আমাকে একটু ভাবতে দাও। এত কিছু একসাথে নিতে পারছি না। ফোনটা রাখছি, পরে কথা হবে।

শেফালীও কথা না বাড়িয়ে বাই বলে বিদায় নিল। তারপর ঘুরে জারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, বাই শব্দটির পেছনেও কোনো ইতিহাস আছে নাকি?

জারা তার মোটা ফ্রেমের চশমাটি আঙ্গুল দিয়ে হালকা নামিয়ে নিয়ে শেফালীকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর একটু মুচকি হাসি দিয়ে ফের পড়তে শুরু করল বইটি। ❑

মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব

অলিতাজ মনি

শিল্পীর সাধনে তুলির আসমানে যেমন ইচ্ছের মেঘ ভাসে–
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবনে বাঁচার ভুবনে আসে–
জননীর কোল আলো করে কেমনে– কন্দরের শিশু হাসে
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবন বাঁচার ভুবনে আসে–
নিশির শিশির প্রভাতে উজ্জ্বল টলমল– এমন নির্মল ঘাসে
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবনে বাঁচার ভুবনে আসে–
স্মৃতির সমৃদ্ধ সমুদ্রের বাঁধনে– সাধনে সৎসাহসের শ্বাসে
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবনে বাঁচার ভুবনে আসে–
অবরুদ্ধ রুখে অন্তর কোঁখে– আত্মতৃপ্তির ব্যাপ্তির মাসে
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবনে বাঁচার ভুবনে আসে–
হৃদয়াকাশ উজাড় অনাবিল– অতল কোলাহল জলগ্রাসে
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবনে বাঁচার ভুবনে আসে–
স্বজন সদন– স্বপ্নের সঙ্গম ফসল শোষকের অসমের ত্রাসে
মুক্তিশক্তি মুজিব শহিদের সজীব– বাঙালির জীবনে বাঁচার ভুবনে আসে–
মুক্তিশক্তি মনোবল– মুজিবের ফসল– প্রাণবন্ত প্রয়াসে ...

তর্জনীর সম্মোহন

মোস্তফা পাশা

উত্তোলিত হলো একটি তর্জনী
উচ্চারিত হলো জয় বাংলা ধ্বনি।

বাঙালির শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হলো সম্মোহনী সুধা
তৃষ্ণার্ত খুঁজে পায় মরূদ্যান–চারিদিকে মুক্তি– স্বাধীনতার ক্ষুধা।
ভেঙে গেল মুনি-ঋষির হাজার বছরের ধ্যান
মসজিদ মন্দির গির্জা একাকার হয়ে
উচ্চারিত হলো বাইবেল-উলুধ্বনি-আজান।

গোলাপ বাগানে প্রস্ফুটিত গ্রেনেডের ছড়াছড়ি
বাঁশঝাড়
অস্ত্রাগার
এস-এল-আর
জীবন্ত লাভাস্রোত যেন প্রতিটি বাঙালি নরনারী।

বাঁশের কঞ্চির মতো লিকলিকে অপুষ্ট-অভুক্ত মানুষগুলো
সুলতানের আঁকা ষাঁড়ের মতো
পরিণত হলো মাংসল দড়িছেঁড়া যোদ্ধায়;
সফেদ পাঞ্জাবি, সাধারণ চপ্পল ঘড়ি কিন্তু মূর্তিমান মহিরুহ
শৈশবের রোগাক্রান্ত চোখে এত দূরদৃষ্টি!
কীভাবে এতদিন ঢাকা ছিল মোটা কালো ফ্রেম চশমায়?

একটি জাতিকে টেনে তোলে ঊর্ধ্বাকাশে– প্রবল বিস্ফোরিত ডিনামাইট
একতলা
দুইতলা
তিনতলা
ছাদের কার্নিশ বেয়ে অবশেষে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট।

একটি জাতির সম্মোহন
একটি জাতির কথন।

অবশেষে তুমি এলে

শেখ সালাহ্উদ্দীন

ছোটো হতে হতে আমরা যখন হয়ে গেছি লিলিপুট
সম্মান আশা স্বপ্ন সাহস নিত্য হচ্ছে লুট
মাথা হেঁট করে আধবোজা চোখে সংকোচে পথ চলি
খুব প্রয়োজনে অস্ফুটস্বরে মেপে মেপে কথা বলি।

এই বদ্বীপের কোমল মাটিতে দৃপ্ত দুটি পা ফেলে
কে জানে কোন সে স্বর্গের থেকে অবশেষে তুমি এলে
মৃতপ্রায় এই বাঙালির দেহে স্পন্দিত হলো প্রাণ
তিমির–বরণ রাত্রিদিনের সেই শুরু অবসান;

সূর্যের দিকে উত্তোলিত সে স্পর্ধিত তর্জনী
কাব্যছন্দে ধ্বনিত অমোঘ বজ্রকণ্ঠ ধ্বনি
সাড়ে সাত কোটি বক্ষে জ্বালালো তীব্র দ্রোহের আগুন
শোষকেরা হলো পুড়ে ছারখার ধ্বংস ভস্ম বা খুন।

অনন্য তাই তোমার নামের অর্থ স্বাতন্ত্র্যতা
শোষণমুক্ত আলোকিত দিন; বাঙালির স্বাধীনতা।
তোমাকে নিয়েই তাইতো রচিত হাজারো কবিতা গান
বাঙালি জাতির পিতা তুমি শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু স্মরণে

আবু জাফর আবদুল্লাহ

শত বরষের তোমার এই জন্মদিনে
তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই মোর।
খোদায় বলি, শান্তির হোক তোমার সব কটি ভোর।
ডুবে থেকো তুমি সুখের আলোয় স্নিগ্ধ শীতল ঘরে।
সতত এই কামনা রইলো তোমার তরে।
জীবন ভর মেনে নিয়েছ অজস্র দুঃখ তুমি।
তাই পেয়েছি আমরা একটি স্বাধীন বঙ্গ ভূমি।
আপন সুখ চাওনি কখনো বঙ্গবন্ধু মোর
মোদের সুখ চেয়ে কেটেছে তব সকাল সন্ধ্যা ভোর।
তোমার এই কীর্তি থাকবে মহান মহীয়ান
যতদিন রবে বাংলার মানুষ, চঞ্চলা নদী বহমান।

স্বাধীনতা

মো. মোশাররফ হোসেন

স্বাধীনতা তুমি এসেছ একাত্তরের রক্তস্রোত শেষে
স্বাধীনতা তুমি অর্জিত অহংকার বিজয়ের বেশে।
দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যারা দিয়েছিল রক্ত
অঝোর অশ্রু নিবেদনে তারা সর্বদাই শক্ত।
শক্তিভরা সাহস আর মনে ছিল অদম্য বল
হাজারো প্রতিকূলে তারা নির্ভীক অবিচল।
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ
তাদের অফুরন্ত বীরত্বগাথা সতত গায় প্রিয় স্বদেশ।

হে বিজয়ী বীর

এনামুল খাঁন

মৃত্যু তোমাকে হারাতে পারেনি
হে বিজয়ী বীর
অগুনতি বাঙালির বুকে
রয়েছে তোমার নীড়।

তোমার বিরহে কাঁদছে দেশ
কাঁদছে দেশের জনগণ
প্রেমের আসন রেখেছে পেতে
সারা বাঙালির গণমন।
তুমিও দেখালে সবার উপরে
প্রেমের আসন পাতা,
সেই আসনে বসেই মানুষ
আকাশের সাথে কয় কথা।

তোমার স্মৃতি মানব-মনে
রবে চির অম্লান,
ধন্য ধন্য তুমি ধন্য
হে জাতির পিতা
শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু তুমি আছ

নীলিমা আক্তার নীলা

আলোকিত করেছ পৃথিবী
করেছ বাংলা ধন্য,
সারা পৃথিবী জানে–
জানে বাংলা নয় নগণ্য।
দেশরত্ন শেখ হাসিনা
বঙ্গবন্ধু তোমার কন্যা,
তোমার স্বপ্ন করেছে সফল
বাংলা আজ গৌরবোজ্জ্বল।
তবু কাঁদে বাংলা
তবু কাঁদে মানুষ,
ভয়াবহ কাল রাত
কলঙ্কিত সেই কালরাত্রি
বহন করেছিল যেসব যাত্রী,
তারা ইতিহাসের কালো অধ্যায়।
বঙ্গবন্ধু তুমি আছ
তুমি আছ ভালোবাসায়
মানুষের মণিকোঠায়
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পাতায়।

পাঞ্জাবির কারুকাজ

লিলি হক

এই বুকে ধিকিধিকি তুষের আগুন জ্বলছিল,
দুচোখে ঝিকিমিকি ফাগুন স্বপ্ন এঁকেছিল।
মহুয়া বনে দোয়েল, শ্যামা গেয়েছিল প্রাণহরা
সুমধুর গান, নীলার মনে বেজেছিল সুরবীণা
সেদিন মনের মাধুরী মিশিয়ে তুমি পরেছিলে
কারুকাজ করা রঙিন পাঞ্জাবি।

মনে পড়ছে ভীষণ একা একা আজ,
পাগল করা হাসিমুখের তুমি আর
পাঞ্জাবির কারুকাজ।

অসম্ভব সুন্দর লেগেছিল ওই রাতে
জীবনের সাথে ছন্দ মেলাতে,
এক বরষার বৃষ্টিতে ভিজেছি
ধিকিধিকি জ্বলে ওঠা আগুন নেভাতে
কী দারুণ পাঞ্জাবির কারুকাজ।

প্রতিচ্ছবি

জুনান নাশিত

কিছুটা অন্ধকারে আলো এসে দাঁড়ালো আজ!

রেললাইনের পাশে ছোট্ট ঘুমন্ত চাঁদ
চোখ খুলে বলে, আহা! কী যে ভিন্নতর, এই জোছনার আকাশ।
হুইসেল বাজাতে বাজাতে থেমে গেল একচিলতে ঘোর
একাকী ভৈরব পাল তুলে দিল
বহুদূর ভেসে গেল সিলভিয়া প্লাথ।

মধ্যরাতে মিহিসুর, আশাবরী রাগ
জলে পুড়ে ছাই হলো প্রিয় রুবাইয়াৎ,

আলো হেসে বলে, জানো না তো
কী যে ছিল দিন!
শীতল তুলোর মতো
রুপালি, মসৃণ।

আজ পেয়ালা প্রাচীর ঘেরা অরণ্য শিশির
ঘুমন্ত চাঁদ চোখ খুলে বলে, তাই তো!
কোথাও তো নেই মধুবন্তীসুর
তানগুলো ক্ষয়ে গেল
নষ্ট হলো তারাদের গোধূলি স্বভাব!

স্বস্তির সন্ধানে

কামাল হোসাইন

শ্বাপদসংকুল পথ পাড়ি দিচ্ছি আমরা;
কেবল আমরাই বা বলি কেন?
গোটা বিশ্বের মানুষ এখন এই অদৃশ্য নারক-থাবায় এক ও অভিন্ন।
এই মারণসম অপ্রতিরোধ্য অস্থির সময়ে কেউ যেন কারো নয়,
সব আপন কেমন করে যেন অচেনা, অজানা সম্পর্কহীন জগৎ-সংসারে।

এতদিনের রক্তের বন্ধনও কেমন করে যেন
সুতোকাটা ঘুড়ির মতো বিচ্ছিন্নদ্বীপের নাগরিক বানিয়ে তুলছে সকলের।

এই অসময় কি আমাদের শেষ বিচারের দিনের কথাই মনে করিয়ে দিল?
যে কঠিন দিনে কেউ কাউকে চিনবে না,
আপন পিতা তার পুত্রকে, পুত্র প্রাণপ্রিয় পিতাকে
মা ছেলেকে, ছেলে তার স্নেহময়ী মাকে
স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রীও স্বামীকে চিনবে না সেদিন। ...

স্বস্তি মিলছে না এখানে আর, স্বস্তির মূল্য অনেক ...
সবাই মিলে বুঝি সেই এক স্বস্তির সন্ধানে ব্যস্ত আমরা।

করোনার ভয় করবোই জয়

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

করোনার কাছে আর আমাদের নয়তো পরাজয়
আল্লাহর রহম করোনার ভয় করবোই এবার জয়।
আমরা সবাই যথারীতি
মেনে চলব নিয়মনীতি
দিলে রাখব আল্লাহ-প্রীতি
ঈমান-আমল ঠিক থাকলে কীসের তবে ডরভয়
ইমানি বলে বলীয়ান আমরা করোনা করবোই জয়।

আসুন আমরা সাবধান হয়ে
সামাজিক দূরত্বে রয়ে
দিব দায়িত্বের পরিচয়।
আল্লাহ ছেড়ে অন্য কারো করবো না আর ভয়
ভয়-ভীরুতা কাপুরুষতা বলবানের জন্য নয়।

প্রয়োজন বা দরকার ছাড়াই
কেউ যেন বাইরে না বাড়াই
কারো ঘেঁষেও কেউ না দাঁড়াই।
আতঙ্কে নয়, সাহস ভরে
থাকব যে যার বাড়িঘরে
দুঃসময়ে সবুর করে
দিই ধৈর্যের পরিচয়।

অসাবধানে এক মুহূর্ত আর তো থাকা নয়
সাবধান ও সচেতন হয়েই করোনা করবো জয়।

আমার গ্রাম

মো. কামাল শেখ

স্নিগ্ধ শীতল একটি নদী একটি বালুর চর
তোমায় দিতে পারবো আমি ছোট্ট মাটির ঘর।

জুঁই চামেলি পারবো দিতে চম্পা কাশের বন
প্রজাপতির রঙিন পাখায় রাঙিয়ে নেয়া মন।

দূর্বা ঘাসের শিশির দেবো শীতের আবির্ভাবে
হেমন্ত আর বসন্তকে উজাড় করে পাবে।

আম কুড়ানো ঝড়ের দিন আর শান বাঁধানো ঘাট
একটা ঘুড়ি তোমায় দেবো একটা সবুজ মাঠ।

তোমায় দেবো শাপলা শালুক হাজার ফুলের সাজে
পাখির গানের পাণ্ডুলিপি সবুজ পাতার ভাজে।

আমি তোমায় বৃষ্টি দেবো টাপুরটুপুর ঝিল
ট্যাংরা পুটি কৈ মাগুরের টলমলানো বিল।

স্লোগান দেবো মিছিল দেবো বজ্রকঠিন ধার
তোমায় দেবো বর্ণমালার অসীম অহংকার।

প্রাণ জুড়াবো তোমায় দিয়ে শীতল বটের মূল
বীর শহিদের রক্তে রঙিন রক্তজবা ফুল।

এসব দিতে পারবো তোমায় একটু যদি আসো
জন্মভূমির মেঘ কাদা জল গভীর ভালোবাসো।

উঠোনজোড়া জোনাক ফুল আর জোছনা ঝরা রাত
পারুল বকুল শিউলি দিলাম নাও বাড়িয়ে হাত।

সময়ের অদম্য স্রোত

রাজিয়া সুলতানা পিংকি

সময়কে বেঁধে রাখা কি যায়
সময় তো দিনে দিনে বদলায়
সাথে প্রিয় মানুষগুলো হারিয়ে যায়
প্রিয় মুহূর্তগুলো স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে রয়।

পাওয়া বা না-পাওয়ার হিসাব
কখনো বুঝে না কাল বুঝে শুধু রব
হৃদয়ের আর্তনাদ কখনো সময় বুঝে না
সময়ের স্রোতে অশ্রুবিন্দু কখনো জলে ভাসে না।

হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নৈপুণ্যে আঁকা
ভালোবাসার যত রং রূপ আর বিবর্ণ ধাক্কা
জীবনের হিসাব কখনো মিলে কখনো মিলে না
জীবনের সাথেই হিসাব মিলায় নতুবা জীবন মানে না।

বর্ষা বন্দনা

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

তোমার এমন দেখে আগমনী
চতুর্দিকে শুনি উল্লসিত ধ্বনি।
দেখে তোমার লাবণ্যময় কাজ
কবি মন খুব আনন্দিত আজ।

আত্মহারা নদী, পানিভরা জল
সমুদ্রে সমুদ্রে অপার কল্লোল
খাল বিল ঝিল, হাওর-বাঁওড়
তরঙ্গিত এবং উৎসব মুখর।

উড়ে যাচ্ছে দূরে সাদা কালো মেঘ
জমা ছিল বুঝি যৌবন আবেগ
বৃষ্টির তুমুল ছন্দ সুরে স্বরে
বর্ষা! সব তোমার বন্দনা করে।

বর্ষাকালে

মো. ইউনুছ আলী

আকাশজুড়ে কালোর মেলা
ভয় ধরে যে ভয়!
কালো রঙের দৈত্য কী রে–
নামছে দেশময়?

একটু পরে বৃষ্টি নামে
মাঠ করে থইথই,
পানির স্রোতে আহা কী যে–
ভয়কাতুরে হই!

হঠাৎ আবার সুয্যিমামা
ঝলসে ওঠে খুব,
ইচ্ছে জাগে মাঠের জলে
দিনজুড়ে দেই ডুব।

এলে বরষা

আল মামুন

জ্যৈষ্ঠের খরতাপ শেষে
যখন তুমি এলে বরষা
কখনো মেঘে আকাশ ভাসে
আবার কখনো রৌদ্রে হাসে
মেঘাচ্ছন্ন রাশভারী গগনটা
নিমিষেই হয়ে যায় ফরসা।
বর্ষায় ঝুপঝুপ বৃষ্টি শেষে
প্রকৃতির দিকে দিলে দৃষ্টি
দেখা যায় কত অপরূপ সৃষ্টি!
মন নেচে ওঠে খুশির আবেশে।

বৃষ্টি বিলাস

ফায়েজা খানম

মেঘলা মেঘলা আকাশ তাই
মাতলা মাতলা মন,
সাজছে কত প্রকৃতি দেখ,
কাঁদছে সারাক্ষণ।
কদম কেয়া স্নান শেষে
মিষ্টি হাসি হেসে,
বলল পথিক যাও নিয়ে যাও
আমায় একটু ভালোবেসে।
রাতের গায়ে ঝিলিক ঝিলিক
ঝলকানিতে বেশ,
গুড়ুম গুড়ুম মৃদু আওয়াজ
বর্ষার সেই রেশ।
ঘরের বাইরে বেলকনিতে
চেয়ার টেবিলের পা,
চেয়ার টেবিলের ঘষাঘষিতে,
হাতে হাতে এক কাপ চা।
টিনের চালে বৃষ্টির ধুম
রিনিঝিনি বাজে,
চঞ্চল মন উদাস উদাস,
মন বসে না কাজে।
মাঝে মাঝে মনে পড়ে
অতীত বর্তমান স্মৃতি।
মাঝে মাঝে শুনি আবার
রবীন্দ্রনাথের গীতি।

ফুল

ফাহমিদাতুন্নেছা

দোলন চাঁপা ফুলের মতন
দুলিছে আমার মন
গন্ধরাজ ফুলের সুবাসেতে
জাগিয়া উঠিছে আমার ভাবান্তর।
কামিনি ফুলের সুবাসেতে আমি
হয়ে যাই বিভোর।
হাসনাহেনা ফুলের মৃদু সুবাস
নেশা জাগায় আমার অন্তর।
শেফালি ফুল কুড়াতে যাই
সুবাসেতে মন গান গেয়ে যায়।
বেলিফুল খোপায় জড়াই
দেহ মনে সুবাস ছড়ায়ে যায়।
কাঁশফুলের শুভ্রতায় মন ভেসে যায়
আকাশের সাদা মেঘের ভেলায়।

এসো মনের পশুকে জবাই করি

হেলাল হোসেন কবির

দেশজুড়ে কঠিন লকডাউন
এরই মাঝে ঘনিয়ে এল ঈদ
মনের মাঝে খুশির জোয়ার।
পশুর হাটে গম গম নেই
দৃষ্টি শুধুই অনলাইনে।
গোয়ালভরা গরু ছাগল শূন্য হবে,
যাদের সামর্থ্য আছে
পশু জবাই দিবে ঈদের দিন।
কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়,
তাই গোশতগুলো ভাগ হবে তিন,
অসহায় পাবে স্বজন পাবে
নিজেও খাবে।
হিংসার চারাগাছ মুছে ফেলতে
আর প্রিয় পশুকে হত্যা করতে
এসেছে ঈদ উল আজহা।
সবাই মিলে হোক ঈদের আনন্দ উপভোগ
সেই সাথে এসো মনের পশুকে জবাই করি।

মিলন মেলা

রুস্তম আলী

ভ্রমর ঘুরে ঘুরে সন্ধান করে ফুলে
ফুলের মধু নাও থাকতে পারে
তবুও আনন্দ মনের।
ঈদের আনন্দ উল্লাস, উচ্ছ্বাস
শুধু মুসলমানদের নয়
আমরা সবাই মানুষ, তাই তো
ঈদের আনন্দ, উল্লাস সবার।
আনন্দ উল্লাসে কোলাকুলি আর
সেলামি নিয়ে মেতে আছে
খোকাখুকি যেন আজ সবার ছুটি।
ঈদের গুঞ্জনে কুঞ্জবনে জোনাকির মেলা
সবাই যেন, নীল আকাশে উড়ন্ত গাংচিল
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান
একই আত্মার প্রাণ।

কোরবানি

সোহেল রানা

পিতার স্বপ্নের কথা ইসমাঈলকে বলতেই
তিনি তখন সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন।
আর যখন তিনি ইসমাঈলকে জবেহ্ করছিলেন–
সৃষ্টিকর্তা বললেন, হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নকেও
বাস্তবে রূপান্তর করে দিলে। আর
তখন স্রষ্টা, সেখানে ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে
একটা পশু স্থানান্তর করে দিলেন
যা পরবর্তী জাতির ওপর নিদর্শন ও শিক্ষণীয়;
এবং তা করণীয় হিসেবে বলবৎ রেখেছেন
ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতি সালাম পৌঁছে দেবার জন্য।

ধ্বনির সায়রে সমর্পিত প্রতিধ্বনি

মনির জামান

প্রতি ভোরেই বিচিত্র সব ধ্বনির ভেতরে
নিজেকে আবিষ্কার করি,
সমর্পিত হই ধ্বনির সায়রে,
ধ্বনিগুলোর আদ্যাক্ষর প্রেরণা, বেদনা,
ভালোবাসা হয়ে কথা কয় আমার সাথে।

গাছেরা যে আরশিতে
মুখ দেখে নেয় অলক্ষে,
জলকৈটভেরা তার ভেতরেও
ডুব সাঁতারে করে ধ্বনির অন্বেষণ।
উদাস রৌদ্র ভীষণ সুন্দরের সেই সব ধ্বনিময়
গান লিখে সবুজ পাতায় মুক্তি দিলে,
পাখিরা শিখে নেয় তার কিছু আর আমি–
ফিরে ফিরে জন্ম নিই ধ্বনির আজানে।

ঘড়ির কাঁটায় কী! এক বিপুল-বিশাল ধ্বনি
বেজে উঠলে আমি পাষাণপাহাড়ে শুনতে পাই
হৃদয়নিংড়ানো পুণ্যগ্রন্থের প্রতিধ্বনি।

ধ্বনিমূলে ফিরে যেতেই
আমি নিশীথে নৈঃশব্দ্যের ভেতর
বার বার জেগে উঠি।
আমি তোমাদের আদি নিবাসে,
ধ্বনিময় হৃদয়ের কাছে আশ্রিত চিরকাল।

আসব আবার গাঁয়ে

রানা হোসেন

ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, আমার সবুজ গাঁয়ে
তারি সাথে ইচ্ছে করে, চড়তে ছোটো নায়ে।
ধানের ক্ষেতে বসে ভাবি, গাঁয়ে ফিরে যাব
ছোটোবেলার খেলার সাথি, হয়ত খুঁজে পাব।

নদীর ঘাটে খেয়া মাঝি, ডাকবে আমায় ওই
সূর্য মামা ডুবে যাবে, কেমনে ঘরে রই?
পৌষ মাসে শীত পড়ে, ফাল্গুন চৈত্রি হাওয়া
বৈশাখ শুরু হয় যেন, কালবৈশাখির ধাওয়া।

ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, বউচি খেলার সাথি
কেমন আছে সোনার ফসল, আছে গাঁয়ের তাঁতি?
স্বপ্ন দেখে চলে যাই, ভোলা আমার গাঁয়ে
হেঁটে যাব সবুজ মাঠে, চপল দুটি পায়ে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ১৩ই জুন ২০২১ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কোনো বিকল্প নেই

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অবক্ষয়িত পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কোনো বিকল্প নেই। পরিবেশ ধ্বংসকারী কার্যক্রম যেমন বন-জঙ্গল ধ্বংস করা, বন্যপ্রাণী নিধন এবং বায়ুদূষণসহ অন্যান্য দূষণ বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আজ মানবজাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এগুলোর টেকসই ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য– 'পরিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে বাংলাদেশ বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' এ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ আইনে পরিবেশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা ও গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী ক্রমক্ষয়িষ্ণু পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের অব্যাহত ধারা-প্রতিরোধে জাতিসংঘ ২০২১-২০৩০ সময়কে 'Decade on Ecosystem Restoration' হিসেবে ঘোষণা করেছে। সরকার জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশগুলোকে সংরক্ষিত এলাকা ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক সেগুলোর প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে যাতে পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নকে বিবেচনায় নেওয়া হয়, সেলক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বিধিব্যবস্থা-প্রতিপালনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৃষি, শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। তবে উন্নয়নকে টেকসই করতে সকল পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা অন্যতম মাইলফলক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা একটি অন্যতম মাইলফলক। ৭ই জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে একথা বলেন। বাণীতে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নে যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাঙালির স্বাধীনতা একদিনে অর্জিত হয়নি। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার দাবিতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রচিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এরপর ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, মুদ্রানীতি, রাজস্ব ও করনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক বাহিনী গঠনসহ এই ছয় দফার মধ্যেই তিনি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন, যার মধ্যে নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণার পর শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেফতার করে এবং তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। তা সত্ত্বেও তিনি ছয় দফার দাবি থেকে পিছপা হননি। তাঁর নেতৃত্বে দাবি আদায়ের আন্দোলন বেগবান হয় এবং তা অল্প সময়ের মধ্যে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফা দাবির সমর্থনে আওয়ামী লীগের আহ্বানে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মদদে পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ জন নিহত হন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ঐতিহাসিক ছয় দফা কেবল বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস। তাই তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার দাবি থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

চিরঞ্জীব মুজিব চলচ্চিত্রের পোস্টার উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জুন গণভবনে এক অনুষ্ঠানে স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবলম্বনে নির্মিত *চিরঞ্জীব মুজিব* পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পোস্টার উন্মোচন করেন। হায়দার এন্টারপ্রাইজের ব্যানারে নির্মিত চলচ্চিত্রটি আগামী আগস্টে মুক্তি পাবে। চলচ্চিত্রটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা নিবেদিত।

পানি নিরাপত্তায় বিশ্বের সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পানি নিরাপত্তার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে ফলাফলভিত্তিক ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ২৫শে জুন পানি ও দুর্যোগ বিষয়ে বিল্ডিং ব্যাক বেটার টুওয়ার্ডস মোর রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবল পোস্ট কোভিড-১৯ ওয়ার্ল্ড শীর্ষক জাতিসংঘের পঞ্চম থিমেটিক সেশনে দেওয়া ভিডিও বার্তায় তাঁর এ আহ্বান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহামারির কারণে ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষতির জন্য টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি কমে গেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি কলেরা, টাইফয়েডের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে। এমতাবস্থায় পানি সম্পর্কিত দুর্যোগ প্রশমনে শক্তিশালী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা সবার দায়িত্ব বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে পাঁচটি পরামর্শও তুলে ধরেন।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ পুরস্কার প্রদান করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩২ জন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে আমরা গুরুত্ব দিতে চাই কৃষিপণ্য বা খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে। এ করোনাকালে যদি উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায় তাহলে নিজেদের চাহিদা যেমন মেটানো যাবে তেমনি অন্যকেও সহযোগিতা করা যাবে। আর রপ্তানির ক্ষেত্রেও পণ্য বৃদ্ধি করতে পারব বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষি খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য চাষি ভাইবোনেরা যেমন কৃতিত্ব পাওয়ার দাবিদার, তেমনি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীরাও সমান কৃতিত্বের অধিকারী। পরে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর বাণী চিরসবুজ ও স্মারকগ্রন্থ চিরঞ্জীব নামে দুটি স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জুন ২০২১ শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবলম্বনে নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'চিরঞ্জীব মুজিব' চলচ্চিত্রের পোস্টার স্বাক্ষরের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

গণতন্ত্রের মুক্তি দিবস

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ২০০৮ সালের ১১ই জুন জননেত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মুক্তি দিবস। গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পায়ে শেকল পরানো হয়েছিল। আর এই দিন জনগণের দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে মুক্ত করে আমরা সেই অবরুদ্ধ গণতন্ত্রকেই মুক্ত করেছিলাম। রাজধানীর কলাবাগান মাঠে স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত '১১ই জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস' উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

শেখ হাসিনার মুক্তির সেই আন্দোলনের পথ ধরে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেছিলেন এবং সেই ধারাবাহিকতায় জনগণ পরপর তিনবার রায় দিয়ে আওয়ামী লীগকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে, জননেত্রী শেখ হাসিনা চারবার দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন অলংকৃত করেছেন বলে উল্লেখ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। কারামুক্তি দিবসের তাৎপর্যের গভীরতা ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, সেদিন জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে মুক্ত করে পরপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার ফলেই আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি আরো বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে আমাদের বড়ো সার্থকতা এখানেই যে, আজ পাকিস্তান আমাদের উন্নতি দেখে হা-হুতাশ করে। সমস্ত সূচকে আমরা তাদেরকে অনেক আগেই পেছনে ফেলেছি। তাদের প্রধানমন্ত্রী যখন পাকিস্তানকে ১০ বছরের মধ্যে সুইডেন বানানোর কথা বলে, তাদের জনগণ বলে– সুইডেন লাগবে না, ১০ বছরের মধ্যে আমাদেরকে বাংলাদেশের অবস্থানে নিয়ে যান। ভারতকেও সামাজিক, মানবিক সূচকে ছাড়িয়ে আমরা তাদেরকে এখন মাথাপিছু আয়েও ছাড়িয়ে গেছি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভারত শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনই দেয়নি, তাদের মানুষ আমাদের সাথে রক্তও ঝরিয়েছে। আমাদের এই উন্নতিতে ভারতে আলোচনার ঝড়, তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, মানুষের টিকে থাকার জন্য পৃথিবী দরকার, কিন্তু পৃথিবীর টিকে থাকার জন্য মানুষ দরকার নেই। বহু প্রাণীর মতো মানুষও বিলুপ্ত হলে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। যেভাবে আমরা পরিবেশ-প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি প্রকারান্তরে আমাদের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করছি। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই পরিবেশ-প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে হবে এবং এজন্য সকল রাজনৈতিক দলকে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণকারী ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসকল কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৫ই জুন বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরের দুই কোটি মানুষ এবং চট্টগ্রাম শহরের প্রায় আশি লাখ মানুষ যদি মনে করে আমি যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সেটি পরিষ্কার করবে তাহলে সেই শহর কখনো পরিষ্কার রাখা সম্ভব হবে না। সেজন্য পরিবেশ বিজ্ঞানের একজন ছাত্র ও পরিবেশকর্মী হিসেবে সবার প্রতি বিনীত নিবেদন জানাই, প্রত্যেকেই যেন তিনটি করে গাছ লাগাই। এটি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্লোগান। একইসঙ্গে নিজের প্রয়োজনে পরিবেশ-প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করি, তাহলেই মানুষ এই পৃথিবীতে টিকে থাকবে।

গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেন, বর্তমান দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকার গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর। কারণ এর মাধ্যমে প্রান্তিক জনপদের অধিবাসীদের অগ্রগতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

১২ই জুন প্রতিমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনি এলাকার সরিষাবাড়ি উপজেলার পিংনা ইউনিয়ন এবং পোগলদিঘা ইউনিয়নের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সমবেত জনতার উদ্দেশে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়তে হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

RvZxq NUbvi we‡kl cwZ‡e`b

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ও দুগ্ধ সপ্তাহ ২০২১ পালিত

১লা জুন: দেশের দুগ্ধ শিল্পকে বিকশিত করে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সারা দেশে পালিত হয় বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ও দুগ্ধ সপ্তাহ-২০২১। বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য ছিল– 'দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টির চাহিদা পূরণ করি'। ১লা থেকে ৭ই জুন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা হয়।

একনেকে ৯ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১লা জুন গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় প্রায় ৫ হাজার ২৩৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৯টি প্রকল্প অনুমোদন করেন।

প্রথম জাতীয় চা দিবস পালিত

৪ঠা জুন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে চা শিল্পে তাঁর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ ৪ঠা জুনকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে '১ম জাতীয় চা দিবস-২০২১' পালিত হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

৫ই জুন: বাংলাদেশকে সবুজে শ্যামলে ভরিয়ে দিতে পালিত হয়ে গেল বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, হোক সবার অঙ্গীকার'।

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস পালিত

৭ই জুন: বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে ঐতিহাসিক ছয় দফা একটি অন্যতম মাইলফলক। ঐতিহাসিক এ দিনটিতে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সকল স্তরের মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জুন ২০২১ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

তৃতীয় ধাপে ১২ হাজার ১১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা প্রকাশ

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের সমন্বিত তালিকা (তৃতীয় পর্ব) প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এতে ১২ হাজার ১১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্‌বোধন

৫ই জুন থেকে ১৯শে জুন পর্যন্ত সরকারের নির্ধারিত ইপিআই কেন্দ্রসহ কমিউনিটি ক্লিনিক ও অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ক্যাম্পেইন শুরু হয়।

ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২১-এর উদ্‌বোধন

ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২১ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্‌বোধন করে যুব ও ক্রীড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ৭ই জুন থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত। প্রতিযোগিতার মূল পর্ব ১৯শে জুন থেকে শুরু হবে।

একনেকে ১০ প্রকল্পের অনুমোদন

৮ই জুন: প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৮ই জুন গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় প্রায় ৬ হাজার ৬৫১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেন।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

এসডিজি অর্জনে শীর্ষ তিনে বাংলাদেশ

বিশ্বে সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে এগিয়ে থাকা শীর্ষ তিন দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্কের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। লক্ষ্য পূরণে ক্রমোন্নতির ফলে এবার এসডিজি সূচকে বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। চার বছর আগে ২০১৭ সালের সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২০তম।

২০১৫ সালে জাতিসংঘে গৃহীত এসডিজিতে ২০৩০ সালের মধ্যে পূরণের জন্য মোট ১৭টি লক্ষ্য স্থির করা হয়। সেসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর অগ্রগতি বিচার করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের পর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোই এসব লক্ষ্য পূরণের পথে বেশি এগিয়েছে। আর ২০১৫ সালের পর থেকে এসডিজি সূচকে স্কোরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে বাংলাদেশ, আইভোরি কোস্ট ও আফগানিস্তান।

এসডিজি সূচকে এবার বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর একশর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৫। আইভোরি কোস্টের স্কোর ৫৭ দশমিক ৫৬। সূচকে অবস্থান ১৩১তম। আর ৫৩ দশমিক ৯৩ স্কোর নিয়ে আফগানিস্তানের অবস্থান ১৩৭তম। এবার তালিকায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকা ফিনল্যান্ডের স্কোর ৮৫ দশমিক ৯।

বিশ্বসেরা ১৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের ৪টি

বিশ্বের শীর্ষ ১ হাজার ৩০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান করেছে বাংলাদেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারলি সায়মন্ডস (কিউএস) তালিকাটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবছরই সংস্থাটি এ তালিকা প্রকাশ করে থাকে।

২০২২ সালের তালিকায় ৮০১ থেকে ১০০০তম অবস্থানের মধ্যে আছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। এ তালিকায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অবস্থান ১০০১ থেকে ১২০০-এর মধ্যে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচটি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিডিএস-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

তালিকায় শীর্ষে রয়েছে–যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। এছাড়া তালিকায় শীর্ষ পাঁচে রয়েছে–ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা বাংলাদেশ

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির অনেক আগেই তলাবিহীন ঝুড়ির বদনাম ঘুচিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, ভাত, মাছ, ফল উৎপাদনেও অনন্য বাংলাদেশ। এখন এগোচ্ছে শিল্পবিপ্লবের পথে। এরই মধ্যে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা কাটিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির মজবুত ভিতেরও জানান দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে। নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ অবকাঠামোও নির্মাণে সক্ষমতা দেখিয়েছে বিশ্বকে। দ্রুত টেকসই উন্নয়ন ও উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়নশীল দেশও এখন বাংলাদেশকে অনুসরণ করছে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন উন্নত দেশ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে দেশ গঠনে নেমেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে ৪৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ নিয়েছে। সময়ের ব্যবধানে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা দেশ হিসেবে দাতা গোষ্ঠীর খাতায় নাম লেখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রথম দফায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, শ্রীলঙ্কাকে ঋণ দিতে আমরা আমাদের সব রকমের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছি। এটা বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণমানের জন্য একটি বড়ো ধরনের ইতিবাচক মাইলফলক। একসময় আমরা শুধু বিদেশি সংস্থা বা দেশ থেকে ঋণ নিতাম। সেদিন বদলে গেছে। আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সক্ষমতায় আমরা এখন অনেকের কাছে অনুকরণীয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানান, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক উপকরণ সোয়াপের (সাময়িক সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ) আওতায় শ্রীলঙ্কাকে এ ঋণ সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশ। সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রার দিক থেকে খুবই দুর্বল কোনো দেশের পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে কারেন্সি সোয়াপ গঠন করা হয়। এর অধীনেই মূলত শ্রীলঙ্কাকে এ ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে নতুন একটি ইতিহাসও সৃষ্টি করবে বাংলাদেশ। সোয়াপের আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশ বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে ভুগলে এর আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার দিক থেকে স্বাবলম্বী দেশগুলো থেকে ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা নিতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী এটা প্রথমে তিন মাসের মেয়াদে দেওয়া যায়। পরে এর মেয়াদ দুই পক্ষের সম্মতিতে বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এটা মূলত সাময়িক কোনো সুবিধা দিতে বা বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে পড়া দেশের পাশে দাঁড়ানোর একটি কৌশল।

জাহাজ নোঙরে রেকর্ড

করোনাকালে মোংলা বন্দর তার ৭০ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। দেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দরে এ বছর ইতোমধ্যে নোঙর করেছে রেকর্ড সংখ্যক জাহাজ। যে-কোনো বন্দরে আগের চেয়ে বেশি জাহাজ নোঙর করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে মোংলা বন্দর দুনিয়ায় এটিই একমাত্র সমুদ্রবন্দর যার সঙ্গে পশ্চাদভূমির রেল যোগাযোগ নেই। পশুর নদের তীরে মোংলা বন্দর অবস্থিত। চলতি অর্থবছরের প্রায় এক মাস বাকি থাকতেই অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ৯১৩টি বাণিজ্যিক জাহাজ নোঙর করেছে এ বন্দরে। গত অর্থবছর এ বন্দরে জাহাজ ভিড়ে ৯১২টি। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছর ৩ কোটি ৬৩ লাখ মেট্রিক টন পণ্য খালাস ও রাজস্ব আসবে ৩৪০ কোটি টাকা, এমনটাই আশা করছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ। মোংলা বন্দরের উন্নয়নে সরকার এ পর্যন্ত যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে তার সুফল হিসেবে করোনাকালে বন্দরটি জাহাজ নোঙরে অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করতে পেরেছে। আশা করা হচ্ছে, এ বন্দরকে কেন্দ্র করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য গতি লাভ করবে। আর তাতে সমৃদ্ধ হবে দেশের অর্থনীতি।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইটি স্কিল্ড প্রফেশনালদের চাহিদা বাড়ছে

দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির পাশাপাশি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরি করতে পারলে দেশে ও বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের অভাব হবে না। করোনা মহামারিতে বিশ্বব্যাপী সাধারণ চাকরির সুযোগ সংকুচিত হলেও তথ্যপ্রযুক্তিতে (আইটি) স্কিল্ড প্রফেশনালদের চাকরির চাহিদা দেশে ও বিদেশে বাড়ছে। ২৫শে জুন রাজধানীতে 'কোভিডকালে চাকরির সুযোগ এবং আইটি খাতের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী এ সময় জানান, বাংলাদেশ ডিজিটাল অবকাঠামোসহ ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করলেও শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ডিজিটাল

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন ৩০শে জুন ২০২১ তথ্য অধিদফতর এবং এটুআই আয়োজিত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার ও সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার সচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

শিক্ষা প্রদানের কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

ভ্যাকসিন পৌঁছাবে ড্রোন

বর্তমানে সারা বিশ্বের করোনা পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে প্রত্যন্ত চরাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকা এবং দেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো প্রকার সংক্রমণের ঝুঁকি ছাড়াই দ্রুততম সময়ে কোভিড ভ্যাকসিন পৌঁছে দিতে সক্ষম ড্রোন তৈরি করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশের খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) যন্ত্রকৌশল বিভাগের একদল ছাত্র।

১৫-১৮ই এপ্রিল ভারতের আইআইটি (Indian Institutes of Technology)-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো টেক ফেসটিভ্যাল। প্রতিবছরের মতো এবছরও এই প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। 'ড্রোন' সেগমেন্ট ছিল এই ফেস্টের অন্যতম সেগমেন্ট। এই সেগমেন্টে কুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের দলটি আন্তর্জাতিকভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) যন্ত্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নিলয় নাথ (টিম লিডার), জাহিদ হাসান, শাহিনুর হাসনাত রাহাত, আয়াজ আল আবরার যৌথভাবে এই ড্রোন তৈরি করেন। এই ড্রোন উদ্ভাবনের কাজ সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল এন নাহিয়ান।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রংপুরের শতরঞ্জি, যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে

শতরঞ্জি হলো একধরনের কার্পেট। শব্দটি ফারসি শতরঞ্জ থেকে এসেছে। শতরঞ্জ হলো দাবা খেলার ছক। দাবা খেলার ছকের সঙ্গে শতরঞ্জির নকশার মিল আছে। সেখান থেকেই নামটি এসেছে।

এক সময় রাজা-বাদশাহদের কাছেও এর কদর ছিল। এ কথা অনেকেই জানেন, মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে শতরঞ্জি ব্যবহার করা হতো। জমিদারদের ভোজনের আসনেও ছিল এর ব্যবহার। এই শতরঞ্জি নদীপথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেত। সময় বয়ে গেছে। একসময় রংপুর থেকে এই বুননশিল্প প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার জেগে উঠছে এই শিল্প। রংপুরের শতরঞ্জি রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রংপুরের নিসবেতগঞ্জ এলাকায় (আদি নাম পীরপুর) এই শতরঞ্জি বুননের কাজ শুরু হয়। বর্তমান বিশ্বে শতরঞ্জি প্রাচীনতম বুননশিল্পের একটি। হস্তজাত এ পণ্য তৈরিতে কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। বাঁশ ও রশি দিয়ে টানা দেওয়া হয়। পাটের তৈরি সুতো দিয়ে সম্পূর্ণ হাতে নকশাখচিত শতরঞ্জি তৈরি করা হয়। কোনো রকম জোড়া ছাড়া যে-কোনো মাপের শতরঞ্জি তৈরি করা যায়।

নতুন করে এই হস্তশিল্পের প্রতি আগ্রহ বাড়ার পেছনে আছে

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন। ১৯৭৬ সালে সরকারিভাবে শতরঞ্জি তৈরির একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সে উদ্যোগ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সেই উদ্যোগই কোনো কোনো মানুষকে এই শিল্পে যুক্ত করে। ফলে ১৯৯১ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে শতরঞ্জির উৎপাদন শুরু হয়। এই শতরঞ্জি এখন শুধু নিসবেতগঞ্জের গ্রামে সীমাবদ্ধ নেই। রংপুরজুড়ে এখন শতরঞ্জি উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে রংপুরের শতরঞ্জি পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর চাহিদা ব্যাপক। 'কারুপণ্য' নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে শতরঞ্জি তৈরির পাঁচটি কারখানা। আরও রয়েছে– 'নীড় শতরঞ্জি', 'শতরঞ্জি পল্লি', 'চারুশী' শতরঞ্জি কারখানা। কারখানা ছাড়াও নিসবেতগঞ্জ এলাকায় বাড়ির আঙিনা কিংবা উঠানে, বাড়ির ছাউনির নিচে নিপুণ হাতে চলছে শতরঞ্জি বুননের কাজ।

ইউরোপ যাচ্ছে বাংলাদেশের আম

হিমসাগর, আম্রপালি, ল্যাংড়া। বিখ্যাত সব আমের জাত। আর বাংলাদেশের এসব আম যাচ্ছে ইউরোপের বাজারে। প্রাথমিকভাবে ২ হাজার ৮শ কেজি আম যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়েছে।

এর ফলে আম উৎপাদনকারীদের জন্য একটি বিশাল বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদনকারীরা তাদের উন্নতমানের আমের জন্য ভালো দামও পাচ্ছেন।

সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার (এফএও) সহায়তায় বাংলাদেশের এসব আম কিনছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো খুচরা পণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট। এসব ফল উৎপাদনে কারিগরি সহায়তা দিয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হর্টেক্স ফাউন্ডেশন। এই সম্মিলিত চেষ্টায় বিশ্ববাজারের ক্রেতাদের জন্য আম এখন থেকে নিয়মিতভাবে রপ্তানির সুযোগ তৈরি হলো।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

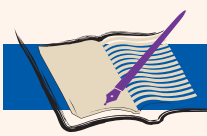

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১৯শে জুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

সঙ্গে সমান তালে ভালো করছে। তাদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট ভালো ভূমিকা রাখছে এবং বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ স্থান করে নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের চাকরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান।

তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আরো মনোযোগী হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন তাদের আন্তর্জাতিক মানের স্কলার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়গুলোকে আরো সফট স্কিল, ইমোশনাল স্কিলের সঙ্গে মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। সেগুলো যদি আমরা শিক্ষার্থীদের দিতে না পারি, উচ্চশিক্ষার যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে না।

শিক্ষকরা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের বাতিঘর

শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে শিক্ষকরাই বাতিঘর বলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি। তিনি বলেন, 'শিক্ষকরাই' শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষকরা তা শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন। তারা শুধু শেখাবেন তা-ই নয়, তাদের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধে গুণান্বিত হতে হবে।' ২১শে জুন শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম অ্যাপের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'অনলাইনে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন' শীর্ষক সভায় এসব কথা বলেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী। অনলাইন শিক্ষকতায় এ প্রশিক্ষণ আরো কাজে লাগবে এবং এটাকে আরো জোরদার করতে হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পরে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন ধলেশ্বরী থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী তিন জন শিক্ষকের হাতে ট্যাব তুলে দেন।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

wewb‡qvM: we‡kl cwZ‡e`b

'বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক' চালু

দেশের আইটি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও দেশীয় আইটি কোম্পানির সাথে যুক্তরাজ্যের আইটি কোম্পানির ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৩০শে জুন ২০২১ উফশী আমনধান ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় নাটোরের সিংড়া উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে 'বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডেস্ক চালু করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৩রা জুন এ ভার্চুয়াল ডেস্কের উদ্‌বোধন করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) এলআইসিটি প্রকল্প ও লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত 'বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক' মূলত বাংলাদেশ-ইউকে বিটুবি আইটি কানেক্টিভিটি হাব, যা দেশের আইটি কোম্পানির সাথে যুক্তরাজ্যের আইটি কোম্পানির ব্যবসায়িক সংযোগ, সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা, যুক্তরাজ্যের বাজার থেকে বিনিয়োগ আনায় ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য bhcl.itconnect.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশ ও ইউকে অ্যাট ৫০ : ফোরজিং এ ডিজিটাল ইকোনমি পার্টনারশিপ' শীর্ষক এক আলোচনায় দক্ষিণ এশিয়া এবং যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক, কমনওয়েলথ এবং উন্নয়ন অফিসে (এফসিডিও) কমনওয়েলথ প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ব্রিটিশ কম্পিউটার সোসাইটির ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর স্টিফেন টোয়েড, বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির বক্তব্য দেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, যুক্তরাজ্য ব্যাবসা এবং বিনিয়োগে বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো অংশীদার। পরিবেশ, প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে দুদেশের ব্যাবসা এবং বিনিয়োগের প্রসার ঘটছে। এবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ব্যাবসা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে চালু করা হলো 'বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে ডেস্ক' শীর্ষক ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম, যা একদিকে যেমন প্রযুক্তি, বিপিও এবং দুদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে সহযোগিতা করবে, অন্যদিকে দেশের আইটি খাতে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, গত এক দশকে দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের ফলে বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ এলাকা মোবাইল ফোন কভারেজের আওতায় এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১১ কোটি ১৩ লাখের বেশি। উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়ার ফলে আউটসোর্সিং, ই-কমার্স, এফ-কমার্সের এবং ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত চ্যাটবট, কনট্যাক্ট ট্রেসার, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল কমার্স করোনা মহামারিতে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাড়ি বসে কাজ করা থেকে কৃষি সরবরাহ সচল রাখার ফলে করোনা মহামারির সময়েও ৫ দশমিক ২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুদেশের মধ্যে উদ্ভাবন এবং আইসিটি খাতে ব্যবসায়িক সহযোগিতা শক্তিশালী করার মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলায় দুদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরামর্শ দেন।

প্রতিবেদন : এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

১০ বছরে নারী হিসাববিদ বেড়েছে সোয়া চার গুণ

সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের (সিএ) মর্যাদা বিশ্বজুড়েই স্বীকৃত। বাংলাদেশে বর্তমানে ২ হাজার ১০০ জন সিএ রয়েছেন। তার মধ্যে ১৩৭ জন নারী সিএ। গত ১০ বছরে দেশে নারী সিএ বেড়েছে সোয়া চার গুণ। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ১৯৭৩ সালে আইসিএবি প্রতিষ্ঠার পরে দেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম নারী সিএ হন সুরাইয়া জান্নাত। তিনি বর্তমানে বিশ্বব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রধান আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন।

আইসিএবি'র তথ্যে দেখা যায়, ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে দেশে নারী সিএ বেড়েছে সোয়া চার গুণ।

বছর	জন	বছর	জন
২০১০	৩২	২০১১	৪০
২০১২	৬৪	২০১৩	৭২
২০১৪	৮৫	২০১৫	৯৫
২০১৬	১০২	২০১৭	১০৯
২০১৮	১২২	২০১৯	১৩৬
২০২০	১৩৭		

একাকী বসবাসের অনুমতি পাচ্ছে সৌদি নারীরা

পুরুষ নিকটাত্মীয় কিংবা অভিভাবক ছাড়া অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা নারীদের একাকী বসবাসের অনুমতি দিচ্ছে সৌদি আরব। ১২ই জুন ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিপেনডেন্ট এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শরিয়া আইনের ১৬৯(বি) ধারা অবলুপ্ত করতে যাচ্ছে সৌদি বিচারিক কর্তৃপক্ষ। এর ফলে দেশটিতে নারীরা নিজেদের পছন্দমতো একাকী বসবাসের সুযোগ পাবেন। সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজের মতো করে একাকী বসবাসের অধিকার রয়েছে। এর ফলে কেউ যদি অপরাধ করে কারাদণ্ড পান তাহলে সাজার মেয়াদ শেষ হলে তাকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করার প্রয়োজন হবে না।

ইউএনসিটিএডি'র প্রথম নারী মহাসচিব

ইউএন কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ইউএনসিটিএডি) নতুন মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কোস্টারিকার মেয়ে রেকেবা গ্রিন্সপ্যাল। তিনিই প্রথম নারী যিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক এই সংস্থার মহাসচিবের দায়িত্ব পেলেন। রেবেকা গ্রিন্সপ্যাল একজন অর্থনীতিবিদ। ১৫ই জুন *প্রথম আলো* পত্রিকায় ইউএন ডটওআরজি-এর বরাত দিয়ে এ খবরটি প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

৫৩ হাজার ৫১৪ অসহায় পরিবার পাবে ঘর

'মুজিব শতবর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'– এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৯ সালের ১২ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তের দিন এ ঘোষণা দিয়েছিলেন টানা চারবারের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এ প্রতিশ্রুতি শুধু মুখের কথা নয়, এটি দৃশ্যমান। ইতোমধ্যে ৭০ হাজার ভূমিহীন মানুষকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও ৫৩ হাজার ৫১৪ অসহায় পরিবারকে দেওয়া হবে নতুন ঘর। আগামী ডিসেম্বর মাসেও এক লাখ পরিবারকে বিনা মূল্যে জমিসহ ঘর দেওয়া হবে। 'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'– এই স্লোগানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর উদ্যোগে মোট ৮ লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এত মানুষকে বিনামূল্যে বাড়িঘর দেওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে নজিরবিহীন বলছেন সংশ্লিষ্টরা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০শে জুন ২০২১ দেশের ৪৫৯টি উপজেলায় ৫৩ হাজার ৩৪০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে জমি ও বাড়ি প্রদান কার্যক্রম (২য় পর্যায়) উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে উপকারভোগীরা আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

সূত্র জানায়, দ্বিতীয় ধাপে ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৩ হাজার ৫১৪টি। দ্বিতীয় ধাপের এ বরাদ্দ হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ৯১২টি, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৬ হাজার ৪৪৮টি। ময়মনসিংহ বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ১৪০টি, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ২ হাজার ৩৭২টি। চট্টগ্রাম বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ১ হাজার ৪০১টি, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৯ হাজার ১৬১টি। রংপুর বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ১২ হাজার ৩৯১টি। রাজশাহী বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ১ হাজার ৫৬৮টি, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৫ হাজার ৬০৪টি। খুলনা বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ৮১২টি, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৩ হাজার ৯৯টি। বরিশাল বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ৭ হাজার ৬২৭টি। সিলেট বিভাগে আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে ২২৩টি, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ১ হাজার ৭৫৬টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ২৭শে জুন ২০২১ কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

সূত্র জানায়, উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

পারিবারিক পুষ্টি বাগান

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহামারি করোনাকালেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। করোনায় খাদ্যসংকট মোকাবিলা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে 'পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৪৩৮ কোটি টাকার এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে। সফলভাবে এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পারিবারিক শাকসবজি ও পুষ্টিচাহিদা পূরণ হবে। ২২শে জুন ঢাকায় বিএআরসি মিলনায়তনে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন' প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে কঠিন তদারকির নির্দেশ দেন কৃষিমন্ত্রী । তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর আমাদের মোট বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা, সেখানে আজকে শুধু বাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপনে ৪৩৮ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রত্যেকটি টাকার হিসাব আমাদেরকে দিতে হবে। যে উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার কতটুকু অর্জন হলো তার গাণিতিক ও বাস্তবসম্মত হিসাব ও মূল্যায়ন করতে হবে। নির্বাচিত কৃষকেরা সবজি উৎপাদন করছে কিনা, অন্যরা উৎসাহিত হচ্ছে কিনা ও উৎপাদিত সবজি খেয়ে তাদের পুষ্টিস্তরের উন্নতি হচ্ছে কিনা– তার যথাযথ মূল্যায়ন রাখতে হবে।

এসময় মন্ত্রী জানান, প্রকল্প গ্রহণের আগে গত বছর দেশব্যাপী ৪ হাজার ৪৩১টি ইউনিয়নে ৩৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪৩৮ কোটি টাকার 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন' প্রকল্পটি এ বছরের মার্চে একনেকে অনুমোদিত হয়। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাংলাদেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের উপস্থাপনায় জানানো হয়, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ৫৩ লাখ বসতবাড়ি রয়েছে। এসকল বসতবাড়ির অধিকাংশ জায়গা অব্যবহৃত ও পতিত পড়ে থাকে। কিছু বসতবাড়িতে অপরিকল্পিতভাবে শাকসবজি আবাদ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার বসতবাড়ির অব্যবহৃত জমিতে ১০০টি করে অর্থাৎ মোট ৪ লাখ ৮৮ হাজার সবজি, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে। বসতবাড়ির স্যাঁতসেঁতে জমিতে কচুজাতীয় সবজির প্রদর্শনীও স্থাপন করা হবে।

এছাড়া, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ১০০টি কমিউনিটি বেইজড ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন পিট স্থাপন করা হবে। উৎপাদিত ভার্মিকম্পোস্ট নিরাপদ ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে এবং গ্রামীণ কৃষক-কৃষানিদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, কৃষক-কৃষানিদের প্রশিক্ষণ ও কৃষক গ্রুপ পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় সবজি সংরক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র আকারে দেশজ পদ্ধতির বিদ্যুৎবিহীন ৬৪টি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে।

অপ্রচলিত ফসল চাষে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটবে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষিকে লাভজনক করতে

হলে কাজুবাদাম, কফি, গোলমরিচসহ অপ্রচলিত অর্থকরী ফসল চাষ করতে হবে। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এসবের বিশাল চাহিদা রয়েছে, দামও বেশি। সেজন্য এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। পাহাড়ে এসব ফসল চাষের সম্ভাবনা অনেক। আনারস, আম, ড্রাগনসহ অন্যান্য ফল চাষের সম্ভাবনাও ব্যাপক। ১৯শে জুন বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় কাজুবাদাম বাগান, কফি বাগান ও আমসহ অন্যান্য ফলবাগান পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার কাজুবাদাম ও কফির উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এসব ফসলের চাষ আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে। এটি করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটবে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানের দর্শনীয় উন্নয়ন হবে। একই সঙ্গে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলা

পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজনের লক্ষ্যে সরকার 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান' হালনাগাদ করেছে, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে, 'ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন রোড ম্যাপ' তৈরি করেছে। পরিকল্পনা মোতাবেক 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড'-এর অর্থায়নে দেশে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

২রা জুন সুন্দরবন ও উপকূল সুরক্ষা আন্দোলন আয়োজিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে দুর্যোগের ঝুঁকি' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, 'ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান প্রোসেস ফর্মুলেশন'-এর জন্য সরকার গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে ২ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন পেয়েছে এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিরসনেও ভূমিকা রাখবে।'

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাব্য প্রভাব নিরসনে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ নামে একশ বছরের কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার উপকূলজুড়ে ৪ হাজার ২৯১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। তাছাড়া দেশে বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অতিরিক্ত ৫২৩টি বন্যার আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় অঞ্চলে পশুপাখির আশ্রয় প্রদানের জন্য ৫৫০টি 'মুজিব কিল্লা' নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদফতর কর্তৃক অ্যাডাপটেশন ফান্ড-এর অর্থায়নে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী ছোট্ট দ্বীপসমূহে বিভিন্ন অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জলবায়ুর পরিবর্তনের ঝুঁকি আমাদের অদম্য অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারবে না।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

we`y: we‡kl cwZ‡e`b

জ্বালানি মিশ্রণে ক্লিন ও গ্রিন জ্বালানির অংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, জ্বালানি মিশ্রণে ক্লিন ও গ্রিন জ্বালানির অংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসবে। ইতোমধ্যে ৫৮ লাখ সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে ২ কোটি গ্রামীণ জনগণকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ২রা জুন 'বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য ক্লাইমেট পার্টনারশিপ' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের পরিকল্পনা ও কৌশল গৃহীত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে গবেষণার জন্য বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল এবং জ্বালানি দক্ষতা অর্জন ও নবায়নযাগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

১২ই এপ্রিল ২০২১ Second virtual Ministerial Meeting of the COP26 Energy Transition Council (COP26 ETC) এবং ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত 'First Round of Energy Transition Council Dialogues'-এর অংশগ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ও জ্বালানির

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২রা জুন ২০২১ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বৈঠকে বক্তৃতা করেন। এর প্রেসিডেন্ট আলোক শর্মা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

ব্যবহার বাড়াতে যুক্তরাজ্য বৈশ্বিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্ত লাইন আন্ডার গ্রাউন্ড করতে হবে। ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগসমূহ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। প্রতিমন্ত্রী ৩রা জুন অনলাইনে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)- এর সাথে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স (এনডিই)-এর ডেসকোর প্রধান কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ইজ অব ডুয়িং বিজনেসে এগিয়ে যেতে হলে দ্রুততার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। মানব সম্পদ সূচকে ভালো করতে হলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও অন্যান্য স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণেও আরো নজর দিতে হবে। পূর্বাচল, উত্তরা, গুলশান ও বনানীতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ভূগর্ভস্থ করার উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

wbivc` moK : we‡kl cwZ‡e`b

সারা দেশে ইঞ্জিন চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ব্যাটারি চালিত রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন ও ভটভটি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমরা লক্ষ করেছি সারা দেশে রিকশা ও ভ্যান ব্যাটারি চালিত মোটর লাগিয়ে রাস্তায় চালানো হচ্ছে। এগুলোতে ব্রেকের সিস্টেমও দুর্বল ও অপ্রতুল। এগুলো যখন হঠাৎ ব্রেক করে তখন প্যাসেঞ্জারসহ উল্টে যায়। হাইওয়েগুলোতেও রিকশা-ভ্যান চলে আসছে। এগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে সারা দেশে পাঠানো হবে। নসিমন-করিমন ও ইজিবাইকগুলো যাতে বড়ো রাস্তায় আসতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। এছাড়া সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত টোল বা রাজস্ব নির্ধারিত টার্মিনাল থেকেই আদায় করতে হবে। যত্রতত্র যানবাহন দাঁড় করিয়ে কোনো চাঁদা আদায় করা যাবে না। ২০শে জুন সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

গাজীপুর-কমলাপুর রুটে তিনটি বিশেষ ট্রেন চালু

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার মহাসড়কে নিত্য যানজটের দুর্ভোগ এড়াতে ২০শে জুন সকাল থেকে গাজীপুর-ঢাকা রুটে তিনটি বিশেষ ট্রেন চালু করেছে রেলওয়ে। সকালে তুরাগ এক্সপ্রেস উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালু হয়। অর্ধেক আসন খালি রেখে ট্রেনগুলো চলবে। শুরুর দিন কিছুটা বিলম্বে ঢাকার উদ্দেশে প্রথম ছেড়ে গেলেও ট্রেন চালু করায় খুশি যাত্রীরা। তবে টিকিট ও বগির সংখ্যা বাড়ানোর দাবি তাদের। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপির প্রচেষ্টায় গাজীপুরের যানজট এড়াতে এ ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকার ৬৮ শতাংশ নমুনায় ভারতীয় ধরন

ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা করোনাভাইরাসের ৬০টি নমুনার মধ্যে ৪১টিতেই ভারতীয় 'ডেলটা ভেরিয়েন্ট' পাওয়া গেছে। ১৭ই জুন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) থেকে জানা যায়, ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা ৬০টি নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশে ভারতীয় ডেলটা ভেরিয়েন্ট পাওয়া গেছে। ২২ শতাংশ নমুনায় পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরিয়েন্ট। বাকি নমুনাগুলো অন্যান্য ভেরিয়েন্টের। ইতোমধ্যে এই ভারতীয় ধরনকে 'উদ্বেগজনক ধরন' হিসেবে বর্ণনা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এর আগে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে করোনার ৫০টি নমুনা পরীক্ষা করে এর মধ্যে ৪০টি ভারতীয় ভেরিয়েন্ট পাওয়া যায়। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ ইনিশিয়েটিভস (আইডিএসএইচআই) ৫০টি নমুনার জিনোম সিকোয়েন্স করে। ৩রা জুন প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ডেলটা ভেরিয়েন্টের সামাজিক সংক্রমণের (কমিউনিটি ট্রান্সমিশন) প্রমাণ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, দেশে গত ৮ই মে প্রথম ভারতীয় 'ডেলটা ভেরিয়েন্ট' শনাক্ত হয়।

দেশে জনসনের টিকার অনুমোদন

জনসন অ্যান্ড জনসনের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা দেশে করোনার জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন। ১৫ই জুন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনসনের টিকাটি এক ডোজের এবং এর সংরক্ষণ তাপমাত্রা দুই থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঔষধ প্রশাসন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, সিএমসি পার্ট এবং রেগুলেটরি স্ট্যাটাস মূল্যায়ন করে টিকাটি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। বাংলাদেশে এই টিকাটির স্থানীয় এজেন্ট

হচ্ছে এমএনসি অ্যান্ড এইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সিনোফার্মের টিকা দেওয়া শুরু

দেশব্যাপী চীনের সিনোফার্মের করোনা টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকার দ্বিতীয় ডোজও দেওয়া হচ্ছে। ১৯শে জুন থেকে এ টিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সিনোফার্মের এ টিকা প্রতি জেলায় একটি কেন্দ্রে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র হিসেবে সরকারি মেডিকেল কলেজকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যেসব জেলায় মেডিকেল কলেজ নেই, সেসব জেলায় সদর হাসপাতাল বা ২৫০ শয্যা হাসপাতালকে টিকা কেন্দ্র করা হয়েছে। প্রথম দিনেই ঢাকায় ৪ হাজার ৩২০ জনকে এ টিকা দেওয়া হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের এ টিকা দেওয়া হলেও পূর্বে নিবন্ধন করা ব্যক্তিরাও এ টিকা পাচ্ছেন।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ড্রেজার স্থানান্তরের জন্য ১০টি টাগবোটের নির্মাণকাজ

ড্রেজার ও নন-প্রপেল্ড ভেসেলসমূহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরের জন্য ১০টি টাগবোট সংগ্রহ করা হচ্ছে। বোলার্ড পুলের প্রতিটি টাগবোটের ওজন ১২ টন। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এগুলো সংগ্রহ করছে। এজন্য ব্যয় হবে ১৬৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এছাড়া আরো সাতটি টাগবোট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, যাতে ব্যয় হবে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন '৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ টাগবোট সংগ্রহ করা হবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড ২০২৩ সালের মে'র মধ্যে টাগবোটগুলোর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করবে।

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১২ই জুন নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দাস্থ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে এবং ১০টি বোলার্ড পুলের টাগবোটের (কিল লেয়িং) নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন।

উল্লেখ্য, বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার-বহরের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ড্রেজিং ক্যাপাসিটি ৩২৫.৬০ লক্ষ ঘনমিটার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৩৫টি ড্রেজারসহ ১৬১টি জলযান সংগ্রহের প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের ৩৫টি ড্রেজারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– দুটি ২৮ ইঞ্চি, আটটি ২৪ ইঞ্চি, আটটি ২০ ইঞ্চি, নয়টি ১৮ ইঞ্চি, দুটি ১২ ইঞ্চি কাটার সাকশন ড্রেজার, দুটি ট্রেইলিং সাকশন হোপার ড্রেজার, দুটি ওয়াটার ইনজেকশন/জেটিং ড্রেজার, দুটি সেল্ফ প্রপেল্ড পন্টুন মউনটেড গ্রাব ড্রেজার। ৩৫টি ড্রেজারসহ ১৬১টি জলযান সংগ্রহের জন্য ব্যয় হবে ৪৪৮৯.০৩ (চার হাজার চারশত

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১২ই জুন ২০২১ নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড ১০টি বোলার্ড পুলের টাগবোটের নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

উননব্বই কোটি তিন লাখ টাকা)। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নদীপথ রক্ষার বিষয়টি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে অনুভব করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নৌপথ খননের লক্ষ্যে সাতটি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন এবং ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোনো সরকার ড্রেজার সংগ্রহ করেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১০ বছরে ৩৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকার ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদীতীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

সৌদিগামী নতুন-পুরাতন সকল প্রবাসী কর্মী ভরতুকি পাবে ২৫ হাজার টাকা

বিএমইটির স্মার্ট কার্ডধারী কিংবা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত সৌদি আরবগামী নতুন-পুরাতন সকল প্রবাসী কর্মীকে হোটেল কোয়ারেন্টিন খরচের সরকারি ভরতুকি পঁচিশ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

প্রসঙ্গত, মহামারি কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সৌদি আরব সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ২০শে মে ২০২১ থেকে ৩০শে জুন ২০২১ পর্যন্ত যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ছুটি শেষে নিজ খরচে সৌদি আরবে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন পালন করেছে বা করবে, তাদেরকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে কর্মী প্রতি ২৫ হাজার টাকা করে ভরতুকি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন কর্মীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সুবিধায় তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই

ভরতুকির টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তার মনোনীত প্রতিনিধির ব্যাংক একাউন্টে শীঘ্র প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.probashi.gov.bd অথবা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট www.wewb.gov.bd অথবা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ওয়েবসাইট www.bmet.gov.bd থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে কিংবা দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ফ্লাইটের দিন বহির্গমনের পূর্বে বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে জমা প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক প্রদত্ত স্মার্টকার্ড বা ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ডের ফটোকপি; পাসপোর্টের প্রথম চার পৃষ্ঠার ফটোকপি; পাসপোর্টের সাথে সংযুক্ত ভিসার ফটোকপি; টিকেটের ফটোকপি ও হোটেল বুকিংয়ের ডকুমেন্ট-এর ফটোকপি।

উল্লেখ্য, সৌদি আরব প্রবাসী যেসব কর্মী ইতোমধ্যে সৌদি আরব চলে গিয়েছে এবং নিজ ব্যয়ে কোয়ারেন্টিন সম্পন্ন করেছে বা করছে তাদেরকে একই নিয়মে সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র পূরণপূর্বক ৩০শে জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ অথবা বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দায় ডাক মারফত জমা প্রদান করতে হবে।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সুফিয়া কামালের জন্মবার্ষিকী

নারী জাগরণের অগ্রদূত কবি সুফিয়া কামাল। প্রগতিশীল সমাজ গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টার ১১০তম জন্মদিন ছিল। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান এই নারী কবি ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।

আজীবন মুক্তবুদ্ধির চর্চার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন তিনি। কবি সুফিয়া কামালের সৃজনশীলতা ছিল অবিস্মরণীয়। ১৯৩৮ সালে এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* প্রকাশিত হয়। ওই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যা সেই সময়ের পাঠক ও লেখকদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আলাদা আলাদা বাণী দিয়েছেন।

সুরে ও ছন্দে বর্ষাবরণ

প্রকৃতির নিয়মেই ঋতুর পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে প্রকৃতি খা খা করে। ঠিক তারপরের ঋতুই হচ্ছে বর্ষা। বর্ষার বৃষ্টিস্নাত আগমনে সিক্ত হয় প্রকৃতি। বর্ষার কদম ফুলের অনিন্দ্য সৌন্দর্যে বৃষ্টিস্নাত দিনে ষড়ঋতুর ভেজা শৈল্পিকতা আর গুড়ুম গুড়ুম মেঘের ডাকে ময়ূরের পেখম তোলা নৃত্যের সুষমা। বর্ষার আগমণে আবহমান বংলার এমন দৃশ্য গ্রামীণ জীবনের প্রাণের সঞ্চার ঘটালেও শহুরে জীবনে এটি রূপকথার গল্পের মতোই। তেমনি বাদল দিনের প্রথম কদম ফোটার দিনটি ছিল ১৫ই জুন ১লা আষাঢ়। এদিন করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নাচ, গান আবৃত্তিসহ নানা আয়োজনে বর্ষাবরণ করে বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ। রাজধানীর গেন্ডারিয়ার সীমান্ত সাহার উন্মুক্ত মঞ্চ অনুষ্ঠিত হয় বর্ষাবরণ উৎসব।

এরপর বর্ষাকথন পর্বে অংশ নেন অধ্যাপক ড. নিগার চৌধুরী, মোরশেদ আহমেদ চৌধুরী ও মানজার চৌধুরী সুইট। সুরের খেলায়, নৃত্যের ছন্দে ও কবিতার দীপ্ত উচ্চারণে আবহমান বাংলার বর্ষা রানির সৌন্দর্য তুলে ধরেন শিল্পীরা।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

অনুদান পেল ২০টি সিনেমা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অনুদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যেখানে রয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ বছর অনুদানপ্রাপ্ত ২০টি চলচ্চিত্রের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি, শিশুতোষ দুটি ও সাধারণ শাখায় ১৫টিসহ ২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অনুদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২০টি চলচ্চিত্রের জন্য এবার দেওয়া হয়েছে মোট ১২ কোটি ২০ লাখ টাকা।

নব্বই দশকের চলচ্চিত্র *ewoi bvg kvnvbv*

নব্বই দশকের এক নারীর জীবনের গল্প নিয়ে নির্মাণ হয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *বাড়ির নাম শাহানা*। গত ২৩শে মে থেকে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে শুরু হয়েছে শুটিং। ১৯৮০-১৯৯০ দশকের প্রেক্ষাপটে রচিত ও নির্মিত হচ্ছে ছবিটি। ২০১১ সালে প্রকাশিত

লীসা গাজীর মূল গল্প অবলম্বনে যৌথভাবে এর চিত্রনাট্য লিখেছেন লীসা গাজী ও আনান সিদ্দিকা এবং পরিচালনা করছেন লীসা গাজী নিজেই। চলতি বছরের শেষদিকে এই চলচ্চিত্রের শেষ ২০

ভাগের শুটিং হবে যুক্তরাজ্যে। এতে দীপা চরিত্রে অভিনয় করছেন আনান সিদ্দিকা।

আট দিনব্যাপী স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসব

শিল্পকলা একাডেমি দেশীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও বিকাশে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বছরজুড়েই চলচ্চিত্রনির্ভর নানা কার্যক্রম থেকে উৎসবের আয়োজন করা হয় একাডেমির পক্ষ থেকে। সেই স্রোতধারায় ১৮ই জুন শুরু হয় 'তৃতীয় বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১'। অনলাইনে অনুষ্ঠিতব্য আট দিনের এ উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র মিলিয়ে ১১৯টি চলচ্চিত্র অবলোকনের সুযোগ পাবেন দর্শনার্থীরা। ৮১টি কাহিনি চিত্রের সঙ্গে প্রদর্শিত হয় ৩৮টি প্রামাণ্যচিত্র। এবারের উৎসবটি উৎসর্গ করা হয়েছে উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেনকে। শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেজে বিনা দর্শনীতে দেখা যাবে উৎসবের জন্য নির্বাচিত ছবিসমূহ।

উৎসবের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে ১৬ই জুন একাডেমির ফেসবুক পেজে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভার্চুয়াল এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এবং একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক আফসানা করিম।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সারা দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রায় ৪০০টি চলচ্চিত্র জমা পড়ে। সেখান থেকে পাঁচ সদস্যের কমিটি উৎসবের জন্য ১১৯টি চলচ্চিত্র নির্বাচন করেন। এর মধ্যে ৮১টি কাহিনি চলচ্চিত্র এবং ৩৮টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র সিলেকশন কমিটির সদস্যরা হলেন– চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদের উপদেষ্টা সাজ্জাদ জহির, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শর্ট ফিল্ম ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ রীতি এবং একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারী পরিচালক চাকলাদার মোস্তাফা আল মাস্‌উদ।

প্রতিবেদন : মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস ২৬শে জুন। এ উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় ২৬শে জুনকে আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

করোনার কারণে এ বছর দেশব্যাপী অত্যন্ত সীমিত পরিসরে দিবসটি পালন করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। তবে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম চালানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাদকের সর্বব্যাপী বিস্তার ঠেকিয়ে তরুণ প্রজন্মকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষায় বাংলাদেশে ২০১৮ সালের ৪ঠা মে দেশজুড়ে বিশেষ অভিযান শুরু করে র‍্যাব। এরপর পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থাও মাদকবিরোধী অভিযান চালায়।

ডোপ টেস্টে পজিটিভ হলে সরকারি চাকরি মিলবে না

ডোপ টেস্টে পজিটিভ হলে সরকারি চাকরি মিলবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছেন, সরকারি চাকরি পেতে হলে প্রত্যেককে ডোপ টেস্টের আওতায় আসতে হবে। ডোপ টেস্টে কেউ যদি পজিটিভ হয়, তবে তিনি সরকারি চাকরি পাবেন না। শুধু নিয়োগপ্রার্থীরা নয়, যারা ইতোমধ্যেই যোগদান করেছেন আমরা তাদেরও ডোপ টেস্টের আওতায় নিয়ে আসছি। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে মাদকদ্রব্য নেশা নিরোধ সংস্থা-মানস আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। আসাদুজ্জামান খান বলেন, বিশেষ করে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীতে যারা আছেন তাদেরও ডোপ টেস্ট করা হচ্ছে। ডোপ টেস্টে যাদের আমরা পজিটিভ পাচ্ছি, তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিচ্ছি। আমরা ২০৩০ ও ২০৪১ সালের যে স্বপ্ন দেখছি, সেটি বাস্তবায়ন হবে না যদি আমরা সবাই মাদকের বিরুদ্ধে কাজ না করি।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, সংস্কৃতি ধারণ, লালন ও চর্চার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহমান থাকে। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেই বর্তমান সংস্কৃতিবান্ধব সরকার জাতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা, বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ২৩ ও ২৪শে জুন দুই দিনব্যাপী গারোদের ঐতিহ্যবাহী 'ওয়ানগালা উৎসব ২০২১'- এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোনা আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ওয়ানগালা গারো সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ও কৃষি উৎসব। এটি মূলত দেব-দেবীদের উদ্দেশে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। প্রতিমন্ত্রী বলেন, গারোরা প্রকৃতি

পূজারি হলেও সাম্প্রতিককালে জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে যে কারণে ওয়ানগালা উৎসব আগের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয় না। তিনি এ বিষয়ে একাডেমির পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমানে ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে আরো ৩টি নতুন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, নওগাঁ ও দিনাজপুর) নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে যেগুলোর জনবল কাঠামো সৃষ্টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে গারোসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ জীবনমানের অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী গারো সম্প্রদায়কে ওয়ানগালার শুভেচ্ছা জানান ও তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

wkï I wK‡kvi Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

শিশু অধিকার ক্ষুণ্ন করছে–যুদ্ধরত এমন গোষ্ঠী বা সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে জাতিসংঘ

গত এক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ৮৫২১ জন শিশুকে। এ সময়ে ২৬৭৪ জন শিশু নিহত এবং ৫৭৪৮ জন শিশু আহত হয়েছে। ২১শে জুন ২০২১ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে শিশু বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশিত হয়।

এ প্রতিবেদনে বিশ্বের যুদ্ধকবলিত এলাকায় শিশু হত্যা, পঙ্গুত্বের শিকার হওয়া, যৌন নির্যাতন, অপহরণ কিংবা সেনা হিসেবে নিয়োগ করা, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিশ্বের অন্তত ২১টি স্থানে ১৯,৩৭৯ জন শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চিহ্নিত করার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনা বেশি ঘটেছে সোমালিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইয়েমেনে।

প্রতিবেদনে শিশু অধিকার ক্ষুণ্ন করছে–যুদ্ধরত এমন গোষ্ঠী বা সংস্থাগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টিই এ তালিকার লক্ষ্য।

শিশু ও দুস্থ নারীদের ৯১ লাখ টাকা অনুদান প্রদান

দেড় হাজারের বেশি শিশু ও দুস্থ নারীদের ৯১ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা সহায়তা ও সাধারণ আর্থিক অনুদান হিসেবে শিশু ও নির্যাতিত দুস্থ নারীদের মাঝে এই অনুদান বিতরণ করা হয়।

বিশেষ সুপারিশ, ব্যক্তিগতভাবে দাখিলকৃত, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ও জেলা মহিলা বিষয়ক

কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে অনুদান প্রাপ্তির জন্য চলতি অর্থবছরে পাওয়া মোট ২১৪৩টি আবেদন পত্রের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে ১৬৫৮ জনকে ৯১ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

২১শে জুন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার সভাপতিত্বে নির্যাতিত, দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিলের বোর্ড অব ট্রাস্টির এক অনলাইন সভায় এ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে যেমন কাজ করছে, তেমনি দুস্থ নারী ও শিশুদের কল্যাণেও কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয় ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাক্টেটিং মা ভাতা হিসেবে ২১ লাখ নারী ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করছে।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

যুব প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০২১

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। Rehabilitation International Korea (RI KOREA) কর্তৃক অনলাইনে আয়োজিত এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে মোট ২০ জন প্রতিযোগী বিসিসি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করে।

১৭ই জুন প্রতিযোগিতার ২টি পর্বের মধ্যে ১ম পর্ব প্রিলিমিনারি সফলতার সাথে শেষ হয়। আগামী অক্টোবরে ২য় পর্ব 'ফাইনাল রাউন্ড' অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর এ আয়োজন সরাসরি অনুষ্ঠিত হলেও কোভিড-১৯-এর কারণে এবার অনলাইনে জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বাংলাদেশসহ মোট ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

আকলিমা আক্তার পেল ল্যাপটপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৬ই জুন ২০২১ জামালপুর পৌরসভার কম্পুপুর গ্রামের শারীরিক

প্রতিবন্ধী আকলিমা আক্তারকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ল্যাপটপ প্রদান করেন। জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আজম ঢাকার আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগে প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে আকলিমা আক্তারের পক্ষে এ ল্যাপটপটি গ্রহণ করেন। জামালপুর প্রান্ত থেকে অনলাইনে যুক্ত হন আকলিমা আক্তার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দ। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, তরুণদের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য জামালপুরে একটি হাইটেক পার্ক নির্মাণ এবং জামালপুরের প্রতিটি উপজেলাসহ দেশের ৬৪টি জেলায় ৫৫০টি 'ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)' স্থাপন করা হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৬ই জুন ২০২১ আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগে জামালপুর পৌরসভার কম্পুপুর গ্রামের কৃষককন্যা প্রতিবন্ধী আকলিমা আক্তারের পক্ষে সাবেক সংসদ সদস্য মির্জা আজমের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী এ ল্যাপটপ প্রদান করেন– পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আইসিটি খাতে বিগত ১২ বছরে ১৫ লাখ তরুণ-তরুণীর প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামীতে ৬৪টি জেলায় বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তাদের হাতে ল্যাপটপ প্রদান করা হবে। এছাড়াও ৪ হাজার ফ্রিল্যান্সারকে ল্যাপটপ উপহার দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা প্রযুক্তিনির্ভর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সে স্বপ্নপূরণের জন্য আইসিটি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সবসময়ই যে-কোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকবে। এছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধীরা অনেকেই প্রতিভাবান উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তাদের প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটাতে এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা আনতে আমাদের সকলের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লেখ্য, জামালপুরের পৌর মেয়র আকলিমাকে স্থানীয় পৌরসভার কর আদায় শাখায় কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেন।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

অলিম্পিকে দিয়া সিদ্দিকী

অলিম্পিকে সরাসরি খেলার সুসংবাদ পেয়েছেন দিয়া সিদ্দিকী। আর্চারির বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) কল্যাণে টোকিও অলিম্পিকে রোমান সানার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন এই আর্চার। বিশ্বের চারটি দেশের চার আর্চারকে ওয়াইল্ড কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দুটি সংস্থা। এর মধ্যে আছেন গত মাসে সুইজারল্যান্ডে আর্চারি বিশ্বকাপ স্টেজ-২ আসরে মিক্সড ডাবলসে রুপাজয়ী দিয়া। গত ২১শে জুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজিবউদ্দিন আহমেদ চপল।

বাংলাদেশ সরাসরি খেলবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে

এশিয়ান কাপ ফুটবল বাছাইয়ের প্লে অফে খেলতে হচ্ছে না বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে। সরাসরি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে খেলবেন জামাল ভূঁইয়ারা। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ যৌথ বাছাইয়ে এখন ৩৯টি দল রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে উত্তর কোরিয়া। ফলে গত ১৫ই জুন এশিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ হওয়া দ্বিতীয় পর্বে পয়েন্টের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ৩৯ দলের মধ্যে ৩৫তম স্থানে রয়েছে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সরাসরি খেলার সুযোগ পাওয়ায় এশিয়ার শীর্ষ স্তরে অন্তত আরও ছয়টি ম্যাচ খেলা নিশ্চিত হলো বাংলাদেশের। ১ থেকে ১৩ নম্বরে থাকা দলগুলো ২০২৩ এশিয়ান কাপে সরাসরি খেলবে।

এবার ক্রিকেটে ছায়া জাতীয় দল

বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন ধারণা নিয়ে এল বিসিবি। এবার 'ছায়া জাতীয় দল' হচ্ছে। যে দলের নাম হবে 'বাংলাদেশ টাইগার্স'। গত ১৫ই জুন মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বোর্ড পরিচালকদের সভা শেষে গণমাধ্যমকে এই তথ্য দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া হবে 'বাংলাদেশ টাইগার্স' নামের ছায়া জাতীয় দল।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ২৬শে জুন ২০২১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে আয়োজিত শেখ হাসিনা ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২০-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

কেন এই দলের প্রয়োজনীয়তা তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাজমুল হাসান। জাতীয় দলের জন্য নতুন ক্রিকেটারদের প্রস্তুত রাখা ছায়া জাতীয় দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতল আবাহনী

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) সুপার লিগের শেষ রাউন্ডের খেলায় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবকে ৮ রানে হারিয়ে হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতল আবাহনী লিমিটেড। এই জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে এবারের আসর সম্পন্ন করল আবাহনী। ২২ পয়েন্ট নিয়ে রানার-আপ হয়েছে প্রাইম ব্যাংক। বিশাল জয়ে ডিপিএলের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখল আবাহনী।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী

আফরোজা রুমা

একুশে পদকপ্রাপ্ত বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪শে মে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। হাবীবুল্লাহ সিরাজী ক্লোন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবুল হোসেন সিরাজী ও মাতা জাহানারা বেগম। তিনি ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকে ১৯৬৪ সালে মাধ্যমিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) স্নাতক হাবীবুল্লাহ সিরাজী ১৯৭২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হন হাবীবুল্লাহ সিরাজী। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদে নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে চার বার দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত জীবনে প্রকৌশলী হাবীবুল্লাহ সিরাজী লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে কবিতা, উপন্যাস ও শিশুসাহিত্য লিখেছেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে– *দাও বৃক্ষ দাও দিন (১৯৭৫), মোমশিল্পের ক্ষয়ক্ষতি (১৯৭৭), মধ্যরাতে দুলে ওঠে গ্লাস (১৯৮১), হাওয়া কলে জোড়া গাড়ি (১৯৮২), নোনা জলে বুনো সংসার (১৯৮৩), স্বপ্নহীনতার পক্ষে (১৯৮৩), আমার একজনই বন্ধু (১৯৮৭), পোশাক বদলের পালা (১৯৮৮), কৃষ্ণ কৃপাণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯০), সিংহদরজা (১৯৯০), ম্লান, ম্রিয়মান নয় (১৯৯২), বিপ্লব বসত করে ঘরে (১৯৯৯), ছিন্নভিন্ন অপরাহ্ন (১৯৯৯), সারিবদ্ধ জ্যোৎস্না (২০০০), সুগন্ধ ময়ূর লো (২০০০), মুখোমুখি (২০০১),স্ত্রী (২০০৫), কতো কাছে জলছত্র, কতোদূর চেরাপুঞ্জি (২০০৬), কাদামাখা পা (২০০৬), ভুলের কোনো শুদ্ধ বানান নেই (২০০৮), শূন্য, পূর্বে না উত্তরে (২০০৯), ইতিহাস বদমাশ হলে মানুষ বড়ো কষ্ট পায় (২০০৯), একা ও করুণা (২০১০), যমজ প্রণালী (২০১১), আমার জ্যামিতি (২০১২), পশ্চিমের গুপ্তচর (২০১২), মিথ্যে তুমি দশ পিঁপড়ে (২০১৪), কবিরাজ বিল্ডিংয়ের ছাদ (২০১৫), বডিমিস্ত্রি ফেসবুক (২০১৬), যে শ্রেষ্ঠ একা (২০১৬), জো (২০১৭), আমি জেনারেল (২০১৮), সুভাষিত (২০১৯), ঈহা (২০১৯)* ইত্যাদি। কবিতা সংকলনের মধ্যে– *প্রেমের কবিতা (১৯৮৯), বেদনার চল্লিশ আঙুল (১৯৯০), জয় বাংলা বলো রে ভাই (২০০০), নির্বাচিত কবিতা (২০০১), তুচ্ছ (২০০৩), স্বনির্বাচিত প্রেমের কবিতা (২০০৪), কবিতাসমগ্র (২০১১), হাবীবুল্লাহ সিরাজীর প্রেমের কবিতা (২০১৬)* উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উপন্যাস হিসেবে– *কৃষ্ণপক্ষে অগ্নিকাণ্ড (১৯৭৩), পরাজয় (১৯৮৮), আয় রে আমার গোলাপজাম (২০১৭) এবং অনুবাদ কর্ম হিসেবে- মৌলানার মন : রুমীর কবিতা (২০১৩), রসুল হামজাতভের কবিতা (২০১৯) উল্লেখযোগ্য। রয়েছে আত্মজৈবনিক গ্রন্থ- আমার কুমার (২০১০)।* গদ্যগ্রন্থ ও শিশুসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে– *দ্বিতীয় পাঠ (২০১০), মিশ্রমিল (২০১২), গদ্যের গন্ধগোকুল (২০১৮), পায়ে উর্বর পলি (২০১৮); ইল্লিবিল্লি (১৯৮০), নাইপাই (১৯৮৪), রাজা হটপট (১৯৯৯), ফুঁ (২০০১), ফুড়ুৎ (২০০৪), মেঘভ্রমণ (২০০৯), রে রে (২০১০), ছয় লাইনের ভূত (২০১১), একে শূন্য (২০১৫), কানাকানি (২০১৩), ছড়াছড়ি (২০১৮), মিলটিল (২০১৯)*। তাঁর সম্পাদিত সাহিত্যপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, (১৯৬৬-১৯৮০) *আগুন আমার ভাই, শতদল, বনানী, কলকণ্ঠ এবং স্বরগ্রাম।*

হাবীবুল্লাহ সিরাজী বাংলা ভাষায় অবদানের জন্য যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৭), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), বিষ্ণু দে পুরস্কার (২০০৭), রূপসী বাংলা পুরস্কার, ভারত (২০১০), কবিতালাপ সাহিত্য পুরস্কার (২০১০), মহাদিগন্ত পুরস্কার, ভারত (২০১১), বঙ্গবন্ধু স্মারক পুরস্কার, ভারত (২০১৩), ফজল শাহাবুদ্দিন কবিতা পুরস্কার (২০১৬), রাষ্ট্রীয় একুশে পদক (২০১৬), সিটি-আনন্দ আলো পুরস্কার (২০১৭), আবিষ্কার পুরস্কার (২০১৭), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (২০১৮), লেখিকা সংঘ পদক (২০১৮), আবু হাসান শাহীন স্মৃতি পুরস্কার (২০১৮), প্রথম আলো পুরস্কার, ভারত (২০১৯) ইত্যাদি বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা-সংবর্ধনায় ভূষিত হয়েছেন।

২৫শে মে সকালে হাবীবুল্লাহ সিরাজীর মরদেহ সর্বস্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সকাল ১০টায় বাংলা একাডেমিতে আনা হয়। এখানে প্রথম জানাজার পর আজিমপুর কবরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে সেখানে দাফন করা হয়। তাঁর প্রয়াণে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 01, July 2021, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd